শহীদ কে. মুখতার ইলাহী
এবং
রংপুরে মুক্তিযুদ্ধ

ড. কে. মউদুদ ইলাহী (জ. ১৯৪৫, রংপুর) রংপুরের এক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পরিবারের সদস্য। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকালীন সময়ে জাষ্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক কর্মকান্ডে একজন সাধারন মাঠকর্মী হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বড় ভাই পাকিস্তান নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ পিএনএস গাজী ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অপর ভাই সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ভিপি (১৯৭০-৭১) ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে শহীদ ফজলুল হক মনি'র তৎকালীন 'বাংলার বাণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তৃতীয় ভাই তখন রংপুরস্থ কারমাইকেল কলেজের ভিপি (১৯৭০-৭১) ছিলেন। এই ভাই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন - তাঁকে কেন্দ্র করে এই পুস্তকের পরিসর।

ড. কে. মউদুদ ইলাহী স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। ইতিপূর্বে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন।

ড. ইলাহী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মূল পুস্তক 'এ্যাসাইনজমেন্ট বাংলাদেশ-৭১ [ঢাকা: মোমিন, ১৯৯১] একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা।

শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাষ্ট
রংপুর

শহীদ মুখতার ইলাহী
এবং
রংপুরে মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদনা ও গ্রন্থণা

কে. মউদুদ ইলাহী

প্রতিষ্ঠাতা

শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাষ্ট

শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাস্ট

রংপুর। ২০১৬

১ম সংস্করণ : ১৯৯৪
২য় সংস্করণ (পরিবর্ধিত) : ২০১৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কে. মউদুদ ইলাহী (১৯৬৮ সালের কে. মুখতার ইলাহী'র ফটো থেকে স্কেচ)।

পরিবেশক
শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাষ্ট
প্রযত্নে/ 'টেথিস'
০০১, রংপুর কমপ্লেক্স
ধাপ, জেল রোড
রংপুর।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ 'শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাস্ট- এর কার্যক্রমে ব্যবহার হবে।

সৌজন্য মূল্যঃ টা. ২৫০.০০ বা ইউ. এস. ডলার ২০.০০

প্রথম সংস্ককরণের মুখবন্ধ

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব উজ্জল অংশ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। ছাত্র-জনতা-কৃষক-পেশাজীবি-সামরিক সদস্য দলমত নির্বিশেষে এই যুদ্ধের অংশীদার। তবুও মুক্তিযুদ্ধের বহু স্থানীয় ঘটনা ও প্রেক্ষাপট আজ বিস্মৃত প্রায়। নতুন প্রজন্মের কাছে রংপুরের মুক্তিযুদ্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরা এবং বিশেষ করে রংপুর শহরের কৃতি মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী'র স্বদেশ মুক্তিতে অবদান স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই সংকলনের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত নব্য পাকিস্তানী ও রাজাকার চক্রের নিপুন প্রচেষ্টায় আজ যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান হুমকীর মুখে তখন নতুন প্রজন্ম এই সংকলন বিধৃত ঘটনাবলী থেকে সাহসী প্রত্যয়ের উপাদান খুঁজে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই সংকলনে বর্ণিত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি আরও তথ্য সমৃদ্ধ আলোকপাত করতে পারেন তবে তা পরবর্তি সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

সংকলনটির বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ 'শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাস্ট-এর মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশমুখী কাজে ব্যবহার হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা কামনা করছি।

কাজী আহসান

লন্ডন। ইংল্যান্ড
৯ নভেম্বর, ১৯৯৪।

দ্বিতীয় সংস্ককরণের মুখবন্ধ

‘শহীদ মুখতার ইলাহী এবং রংপুরে মুক্তিযুদ্ধ’ পুস্তকটি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর গত প্রায় দুই দশকে মুখতার ইলাহী সম্পর্কে অনেকে তথ্যবহুল আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সহকর্মী এবং সহযোদ্ধারাও আরও তথ্য প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে এই সময়কালে দেশের শীর্ষ পত্র-পত্রিকাসমূহে তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বেশ কিছু আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। অপরদিকে, রংপুর কারমাইকেল কলেজে স্বাধীনতা ভাস্কর্য কর্মে তাঁর মুখচ্ছবি ব্যবহার হয়েছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ তাঁর নামে হয়েছে। এ সমস্তে শহীদ মুখতার ইলাহী’র অবদানের যথাযোগ্য মূল্য কেবল দেয়নি, বরং সমগ্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগকে সম্মানিত করা হয়েছে।

পুস্তকটি বর্তমান সংস্করণে উপরোক্ত বিষয়াদির উপর তথ্যবহুল আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। দেশে যখন চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীদের অশুভ চক্রান্ত চলছে তখন শহীদ মুখতার ইলাহী’র জীবন, কর্ম, অবদান এবং আদর্শ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করবে - ঠিক যেমনটি শহীদ মুখতার প্রজন্ম করেছিলেন - এটা আমাদের বিশ্বাস।

‘শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাস্ট’ এমনই লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা ঃ ৯ নভেম্বর, ২০১৬। কে. মউদুদ ইলাহী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সহযোগীবৃন্দ (আইর খামার) :
আইর খামার গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, বড়বাড়ি ইউনিয়নের আইর খামার গ্রামবাসী এবং আইর খামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। ওয়াজেদ আলী মাস্টার, রশিদুল কবির, মোঃ ইলিয়াস, আনোয়ার মাস্টার, জাকিরুল ইসলাম মিলন এবং জয়েন উদ্দিন।

সহায়ক ব্যক্তিবৃন্দ (রংপুর) :
সুনীল কুমার গুহ, সুকুমার বিশ্বাস, শহীদুল ইসলাম বাবুল, ড. সাবিহা সুলতানা, ড. কে. মুশতাক ইলাহী, খয়রুল আলম, মাহবুবুর রহমান, কে. মাহফুজ ইলাহী (খশরু), মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী (পল্লব) এবং কে. তউফিক ইলাহী (দীপ্ত)।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :
আজকের কাগজ, সংবাদ, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, প্রথম আলো, সমকাল, প্রথম খবর, যুগের আলো, অটল এবং দি ডেইলি স্টার।

সূচীপত্র

ব্যক্তি ও কর্ম

সূচীপত্র

স্মরণ ও বিস্মরণ

স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি

যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ

মুক্তিযুদ্ধের লাখো বীর শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধা
ও নির্যাতিতাদের স্মরণে

শহীদ কে. মুখতার ইলাহী

(জ. ২৬ মার্চ, ১৯৪৯; মৃ. ৯ নভেম্বর, ১৯৭১)

ব্যক্তি ও কর্ম

খোন্দকার মুখতার ইলাহী : সহপাঠী থেকে সহযোদ্ধা

সৈয়দ জিয়াউল হক (সেবু)

১৯৭০ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র লীগ প্যানেল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। মাহাবুবুল বারি, ভি পি এবং জায়েদুল ইসলাম জি এস নির্বাচিত হন। এই প্যানেলে খোন্দকার মুখতার ইলাহী সর্বোচ্চ ভোটে পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে, জেলা ছাত্র লীগের কারমাইকেল কলেজ শাখার নতুন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি হন অলোক সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক পীরগঞ্জের আব্দুস সালেক। মুখতার ইলাহী প্রচার সম্পাদক এবং আমি সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করি।

কলেজ জীবন

মুখতার কলেজ সংসদের পত্রিকা সম্পাদক হওয়ার কারণে রংপুরের সেই সময়ের নাম করা প্রেস, যেমন জয় প্রেস, আজাদ প্রেস, লিসবন প্রেস, এমনকি জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রেসেও আমাদের অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। প্রতিটি প্রেসই আমাদেরকে যথেষ্ট সমীহ করতো। আমাদের যখনই প্রয়োজন হতো হ্যান্ডবিলের, মূহুর্তেই তা ছাপাতে পারতাম।

অলোক সরকার, দর্শনার টুকু ভাই, রফিকুল ভাই, বারি ভাই আমাদেরকে অনেক সময় উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেন সংগে সংগে হ্যান্ডবিল লিখে প্রেস থেকে বের করার জন্য ব্যবস্থা নিতেন। প্রায় সময়েই অর্থের অভাবে কাগজ কিনে দেওয়ারও সম্ভব হতনা। আমরা বাকীতে লিসবন প্রেসে গিয়ে মনিরুজ্জামান ভাইয়ের কাছ থেকে কাগজও কিনে নিতাম।

হ্যান্ডবিল বা ব্যাজ সরবরাহ করা আমাদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। ছাত্র লীগের নানান মিছিলে আমরা অজস্র ব্যাজ ছাপিয়ে সরবরাহ করতাম। অনেক সময় কলেজ পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন প্রকার হ্যান্ডবিল ছাপানোর দায়িত্ব আমাদের উপর দেওয়া হত। মুখতার রাত দেড়টা-দুইটা পর্যন্ত প্রেসে বসে প্রুফ দেখে দিত। পরের দিন স্কুল-কলেজে সেই সব হ্যান্ডবিল সরবরাহ করা হতো। কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠানে যেমন ছিল মুখতারের উপস্থিতি তেমনি দলের কাজেও তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হতো।

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরির পশ্চিম পার্শ্বের একটি কক্ষে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ছিল। আমরা দু'জনে এর সদস্য ছিলাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য আসর বসত। আমরা স্বরচিত

কারমাইকেল কলেজ

কবিতা আবৃত্তি করতাম। মুখতার কখনো কখনো সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাতেও যোগ দিত। সাহিত্যের উপর মুখতারের যথেষ্ট দখল দেখে অনেক প্রবীণরাও তার প্রশংসা না করে পারতেন না (পরিশিষ্ট-১)।

Students` Forum-এ আমাদের অনুষ্ঠান করার জন্য রংপুর বেতার কেন্দ্র থেকে ডাকা হল। আমরা অধ্যাপক আব্দুল হাই সাহেবের নেতৃত্বে বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান করতাম যা সরাসরি প্রচার করা হতো। সেখানে মুখতার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতো। তখন অনুষ্ঠান করে আমরা বিল পেতাম ১৫ টাকা, এটাই আমাদের জীবনের প্রথম উপার্জন। অনুষ্ঠানের বিল পরিশোধ করা হতো এ্যাকাউন্ট চেকের মাধ্যমে। আমরা ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান (যেটা এখন সোনালী ব্যাংক) থেকে ৫ টাকা দিয়ে এ্যাকাউন্ট খুলে চেক জমা দিতাম। প্রায় প্রতি মাসে না হলেও মাঝে মধ্যে প্রোগ্রাম পেতাম। তখন রেডিও কেন্দ্র ছিল শহরের বাইরে। উত্তম ইউনিয়নে যাওয়া-আসা ছিল খুবই কষ্টকর যদিও আমার মটর সাইকেল ছিল। একবার অনুষ্ঠানে সামছুন নাহার আমাদের সংগে অংশ নেয়। অনুষ্ঠান শেষে ফেরার রিকসা নাই। এত দূর থেকে হেঁটে আসা কঠিন। সামসুন নাহার মটর সাইকেলে চড়ে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত এসে রিকসায় উঠলে তাকে নামিয়ে দিয়ে আবার বেতার কেন্দ্রে গিয়ে মুখতার আর স্যারকে নিয়ে শহরে এলাম। বেতার কেন্দ্রের আবু জাফর আব্দুল্লাহ (তৎকালীন প্রোগ্রাম প্রডিউসার)-ভাইয়ের সংগে এখানে দেখা হয়। তিনি এখন অবসর গ্রহণের পর রংপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করছেন।

সাহিত্য সপ্তাহ

কলেজে সপ্তাহব্যাপী সাহিত্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল খালেক কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন অধ্যাপক আজহার আলী এবং সভাপতি অধ্যক্ষ নাসিমউদ্দিন আহমদ। আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো মঞ্চ-সজ্জার, মুখতার আর্ট পেপার কেটে আঠা দিয়ে মঞ্চ সাজালো। আমরা তাকে সাহায্য করলাম। মুখতার এবার সংস্কৃতি সপ্তাহে নিজেও অংশ নিল। গানের তালে ছবি আঁকায় এবং উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম পুরস্কার পেল। আমিও রবীন্দ্র সংগীতে পুরস্কার পেয়েছিলাম।

ছাত্র সংসদের নাট্যতে "বৌদির বিয়ে" নাটকটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত হয়। কাহিনী শৈলেন গুহ নিয়োগীর। নাটকটিতে দুইটি নারী চরিত্র রয়েছে। ইতিপূর্বে কারমাইকেল কলেজের ছাত্রী দ্বারা নারী চরিত্রে কখনও অভিনীত হয়েছে বলে শুনা যায় নাই। ছাত্র সংসদের সবাই আমরা অধ্যক্ষ স্যারের কাছে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি সম্মতি দিলেন না। সবশেষে শর্ত দিলেন যদি কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে এবং তার সমস্ত দায়দায়িত্ব ছাত্র সংসদ গ্রহণ করে তবেই তিনি সম্মতি দিতে পারেন। অলোক সরকার, বারি ভাই এবং মুখতার স্যারের সংগে দেখা করে সম্মতি নিলেন। সেই সংগে মমতাজ রহমান এবং সামসুন নাহার নামের দুই ছাত্রী অভিনয় করার জন্য সম্মত হলো। আমাদের মধ্যে ঐক্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হৃদ্যতার কারণে বিষয়টি সম্ভব হয়েছিল।

মুখতারও নাট্য ও প্রমোদ বিভাগের সম্পাদক ইব্রাহীম আলীর সংগে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য। নাটক পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শাহ আব্দুল হাই এবং অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পিছনে ছাত্র-শিক্ষক সবারই আন্তরিকতার অভাব ছিলনা, তারপরও মঞ্চ সজ্জার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় মুখতার ইলাহীকে। নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চায়ন হয় এবং অধ্যক্ষ নাসিম উদ্দিন আহমদ সাহেব অভূতপর্ব সাফল্যের জন্য ছাত্র সংসদের ভূয়সি প্রশংসা করলেন। নাটকটি রাত ১১টার দিকে শেষ হয়। সবাই শান্তিপূর্ণভাবে কলেজ থেকে বাসায় যায়। ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য তখন কলেজে একটি বাস ছিল। নাটক শেষ হওয়ার পরে, একজন শিক্ষক এবং মাহবুবুল বারি ভিপির তত্ত্বাবধান মেয়েদেরকে শহরে বাড়ি বাড়ি পৌছিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম শহীদ মিনার

কারমাইকেল কলেজে ভাষা শহীদদের স্মরণে কোন শহীদ মিনার ছিল না। পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে তিনটি পিলারের একটি শহীদ মিনার ছিল। আমরা প্রতি বছরেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেই পুষ্পমাল্য অর্পন করতাম। এবার ২১শে ফেব্রুয়ারির আগে মুখতার সিদ্ধান্ত

শহীদ মিনারেই পুষ্পমাল্য অর্পন করতাম। এবার ২১শে ফেব্রুয়ারির আগে মুখতার সিদ্ধান্ত নিল যে কলেজে একটি শহীদ মিনার তৈরী করা হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। আমরা বিকাল বেলা পিছনের বিল্ডিং কাজ করা ঠিকাদারের কাছ থেকে কিছু ইট নিয়ে তিনটি পিলার তৈরী করলাম (যেখানে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় জিএস আকবার আলী বর্তমান শহীদ মিনার তৈরী করেছেন)। ঐ লিচু গাছ তলায় মুখতার প্রথম শহীদ মিনার স্থাপন করে।

শহীদ মিনার তৈরীর দিন এক মজার ঘটনা ঘটল। আমরা সবাই যখন ইট-বালু সংগ্রহে ব্যস্ত এই সময় খুব দামী স্যুট পরা ও হাতে দামি সিগারেটের প্যাকেট এক ভদ্রলোক অধ্যক্ষ সাহেবের রুমের সামনের বারান্দায় ঘোরাফেরা করেন আর আমাদের দিকে লক্ষ্য করেন। আমাদের সকলের ধারণা ভদ্রলোক হয়তোবা কোন গোয়েন্দা বিভাগের লোক হবে। মুখতার আমাদেরকে সাবধান থাকতে বললো। মুখতার আমাকে কথা বলার জন্য যেতে বললো। আমি গিয়ে ওনাকে পরিচয় দিতে বললাম। সহাস্যে ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে উনি এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন বর্তমানে সাত্তার জুট মিলে চাকরি করেন, বাড়ি বাবু খাঁ, নাম মোফাজুল - আমাদের কর্মকান্ডে তাঁর যথেষ্ট সমর্থন আছে। আমরা সন্ধ্যার পরও তিনটি পিলার তৈরী করা পর্যন্ত উনি আমাদের সংগে অবস্থান করেন নানা ধরনের উৎসাহ দিলেন। তারপর থেকেই আমরা তাঁকে মোফাজুল ভাই বলেই অভিহিত করতাম। রংপুরের রাজনীতির সংগে পরবর্তী সময়ে তিনি জড়িত হয়েছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রভাত ফেরির জন্য অলোক সরকার এবং তৎকালীন ভিপি মাহবুবুল বারি ট্রাক ও মাইক সংগ্রহ করলেন। আমরা প্রত্যুষে ট্রাকে চড়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো' গান গাইতে গাইতে কারমাইকেল কলেজে মুখতারের নির্মিত শহীদ মিনারে ফুল দেই। হোস্টেলের আরও অনেকেই আমাদের সংগে যোগ দেয়। তারপর আমরা ট্রাক যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসি। এখানে অলোক সরকার দেশের জন্য আমাদের শপথ বক্তৃতা দেন। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা দিবস সমাপ্ত হয়।

আগেই বলেছি, মুখতার ছিল পত্রিকা সম্পাদক। তার কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হলো। পত্রিকার অবয়ব দেখে সবাই মুগ্ধ। কলেজে মুখতার অপ্রতিদন্দ্বী ছাত্র নেতা হিসাবে অবস্থান করে নিয়েছিল। যার ফলে পরের কলেজ নির্বাচণে খুব সহজেই ভিপি নির্বাচিত হয়। সেই নির্বাচণে আমি পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হই। তার পিছনেও মুখতারের একটি পরিকল্পনা ছিল। তা হচ্ছে পত্রিকা সম্পাদক হলে প্রেসগুলোর সংগে আমাদের ভাল যোগাযোগ থাকবে এবং আমরা দলের জন্য নানান ধরনের সহযোগিতামূলক কাজ করতে পারবো। পরবর্তীতে আমরা তাই-ই করেছি।

অন্যান্য কর্মকান্ড

এখন বলা যাক পিকনিকের কথা। আমরা ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই অধ্যাপক শাহ আব্দুল হাই এবং মুখতারের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর কলেজ থেকে পিকনিক করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাই। গাড়ি সংগ্রহ, ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা, তাদের কাছ থেকে পিকনিকের জন্য টাকা সংগ্রহ করা, সেই সংগে খাদ্য তালিকা নিয়ে স্যার এবং ছাত্রদের সংগে আলোচনা করে নির্ধারণ করা, স্থান নির্ধারণ করা থেকে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রধান দায়িত্বেই ছিল মুখতার ইলাহী।

আমরা প্রথম বৎসর মহাস্থানগড়ে পিকনিক করতে যাই। পিকনিক থেকে এসে সবাই খুবই আনন্দিত। পরের বছর আমরা রামসাগরে পিকনিক করতে যাই। রামসাগরে পিকনিক করতে গিয়ে সামছুল ভাই (ইসলামের ইতিহাস অর্নাস ক্লাসের ছাত্র এবং পরবর্তী সময় মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান) রামসাগর গেস্ট হাউসের গেটের সংগে ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান। সবাই তাঁর যত্নে ব্যস্ত। তিনি কিছুক্ষণ পর ঠিক হলে সবাই তাকে নিয়ে খুবই হাস্য-তামাশা শুরু করি আর বেচারা খুবই লজ্জিত হন।

তার পরের বছর দূরত্ব বিবেচনা করে আবার মহাস্থানগড় পিকনিকের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। আমাদের জীবনের সর্বশেষ পিকনিক হয় তেঁতুলিয়া। স্যার, মুখতার অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা সাব্যস্থ করলো যে এবার তেঁতুলিয়া যাবে। সেই হিসেবে প্রত্যুষে যাত্রা শুরু হলো। মুখতার সকালে আমাদেরকে বাসের মধ্যে নাস্তার ব্যবস্থা করলো, যাত্রা শুরু হলো কিন্তু বাদ সাধলো দূরত্ব। তেঁতুলিয়া সার্কেট হাউজ পর্যন্ত গেলে দুপুরের খাবার সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। তদুপরি রংপুরে ফিরতে অনেক রাত্রি হবে। আমাদের সংগে অনেক ছাত্রীও ছিল। তাই পথের পার্শ্বে একটি নদীর পাড়ে গাড়ি থামান হলো এবং সেখানে পিকনিকের ব্যবস্থা করা হলো। এটাই ছিল আমাদের অনেকের জীবনে শেষ পিকনিক। মুখতার এই পিকনিকগুলোতেও তার সাংগঠনিক দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিল।

রাজনৈতিক কর্মকান্ড

রংপুরে ৬ দফা, ১১ দফা এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যে ছাত্র নেতারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে হারেছ উদ্দিন সরকার, ইলিয়াছ আহম্মদ, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, অলোক সরকার, মাহবুবুল বারী, মনছুর আহমেদ, মুখতার ইলাহী এবং নুরুল রসুলের নাম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

হারেছ উদ্দিন সরকার ছাত্র লীগের নিবেদিত কর্মী। রংপুর কলেজের ছাত্র এবং রংপুর জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগের সবার সংগে তাঁর যোগাযোগ। অলোক সরকার, বারী ভাই, গোলাপ ভাই এবং আমাদের সিনিয়রদের সংগে হারেছ ভাইয়ের ছিল হৃদ্যতা কিন্তু আমাদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। সেই সময় ছাত্র লীগ বলতে হারেছ ভাইকেই বুঝাত।

ঢিলে ঢালা ময়লা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা সন্ডেল পায়ে হারেছ উদ্দিন সরকার সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সংগে তার যোগাযোগ। তাঁরাও হারেছ ভাইয়ের ছাত্র লীগের অক্লান্ত পরিশ্রমী সংগঠক হিসেবে যথেষ্ট মূল্য দিতেন। এখন কারণে অকারণে হারেছ ভাই মুখতারের সংগে দেখা করেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন (স্বাধীনতার পরে তিনি 'বীর প্রতিক' উপাধিতে ভূষিত হন)।

আমরা মাঝে মাঝে সেন্ট্রাল রোডে নিরালা চা'র দোকানে বসতাম। হারেছ ভাই সেখানে আমাদের সংগে দেখা করেন। মুখতার-এর সংগে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ছাত্র লীগের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হন। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কি করা দরকার সে সম্পর্কে অবহিত করেন। আমরা কারমাইকেল কলেজের বাহিরে ছাত্র লীগ কর্মীদের সংগে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলাম।

দেশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। রংপুরের রাজনীতিও উত্তাল রূপ ধারণ করছে। আমরা কারমাইকেল কলেজ থেকে মিছিল সহকারে শহরে আসি। ছাত্রনেতারা পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে মিটিং করেন। মিটিংয়ে বক্তৃতা করেন হারেছ উদ্দিন সরকার, ইলিয়াছ আহমদ, জাকির হোসেন সাবু, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, মনছুর আহম্মদ প্রমূখ। কোন কোন দিন আগামী দিনের কর্মসূচীও ঘোষিত হয়। আমরা সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করি। রংপুরের প্রতিটি স্কুল থেকে মিছিল বের করা হত। রাজপথ মিছিলে মিছিলে একাকার। সবার মুখে একই স্লোগান 'আইয়ুব খানের গদিতে আগুন জাল একসাথে'। কোন কোন দিন হারেছ ভাই আমাদেরকে কাগজ কিনে দিতেন পোষ্টার লেখার জন্য। কোন এলাকায় পোষ্টার লাগাতে হবে তাও বলে দিতেন। মুখতার পোষ্টার লিখতো, আমরা কখনো রাত্রে কখনো বা প্রত্যুষে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লাগাতাম। পোষ্টার লাগাবার সময় প্রায়ই শরিফুল আলম (মকবুল) আমাদের সংগে থাকতো। ছাত্র আন্দোলনের সংগে জনতার সমর্থন দিন দিন অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়তে শুরু করলো। কখনো কখনো ছাত্র মিছিলকে জনতা হাত নাড়িয়ে সমর্থণ দিত এবং উৎসাহিত করতে দ্বিধা করতো না। তখন

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জোরদার হতে শুরু করলো।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহারের দাবি অচিরেই শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে লাগলো। ছাত্র লীগের কর্মীদের মিছিলে স্লোগান ঃ 'আগরতলা মামলা প্রত্যাহার কর', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'আওয়ামী লীগের ৬ দফা মানতে হবে', 'আইয়ুব শাহীর গদি ছাড়তে হবে'।

এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবী পেশ করে। সমগ্র দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি ছাত্র আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তুললো। প্রায় প্রতিদিনেই মিছিল মিটিং লেগেই থাকত, ছাত্রদের স্লোগান ঃ '৬ দফা ১১ দফা মানতে হবে নইতে গদি ছাড়তে হবে', 'আগরতলা মামলা তুলে নাও তুলতে হবে', 'শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে'।

পুলিশের বাড়াবাড়ি, সরকারের পেটোয়া ছাত্রদল-এর গুন্ডাদের ফালাফালি, বিহারীদের অমার্জিত ব্যবহার জনতাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। ছাত্র নেতাদের উপর হুলিয়া ছাত্র সমাজকে আরও আন্দোলন মুখী করে তুললো। ছাত্ররা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, অফিস থেকে আইয়ুব খানের ছবি ভাংচুর করতে শুরু করে দিল। রংপুর যেন মিছিলের শহরে পরিণত হল।

প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ

স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনা নিবাসের বিশেষ জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করলো। এই হত্যার ফলে বাংলার ছাত্র-জনতা কঠিন আন্দোলনে নেমে পড়ে। এই আন্দোলন শুধু মাত্র ছাত্র আন্দোলন রইল না, তা জনতার আন্দোলনে রূপ নিতে থাকলো। অপরদিকে, সামরিক সরকার আন্দোলনের মুখে দিশাহারা হয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে প্রকাশ্যে দিনের বেলা হত্যা করলো। তখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আর ছাত্রদের আন্দোলন রইল না। তা হয়ে গেল বুদ্ধিজীবী-কর্মজীবী এবং সাধারণ জনতার আন্দোলন।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যার পরপরই মুখতার 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা কমিটি'র মিটিং আহ্বান করলো। সেই মিটিং-এ মুখতার সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুকে বাংলার স্বাধীনতার

যুদ্ধে প্রথম শহীদ বলে আখ্যায়িত করলো যা পরবর্তিতে জাতীয় পত্রিকাতেও সার্জেন্ট জহুরুল হককে বাংলার স্বাধীনতার প্রথম শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নতুন নতুন কর্মসূচী ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলনে রূপ নিল। রংপুরে ছাত্র লীগের প্রতিটি সভা-সমিতিতে মুখতার প্রতিনিয়ত অংশ নিতে থাকে এবং ছাত্র লীগ জেলা শাখায় তার গুরুত্ব বেশ বাড়তে থাকে। কর্মী এবং নেতাদের কাছেও মুখতার যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কারমাইকেল কলেজেরও প্রতিটি অনুষ্ঠানে মুখতারের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, অনুষ্ঠানের উৎকর্ষতা এবং সাফল্য তার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। একইভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিটি কর্মসূচীতেও মুখতারের উপস্থিতি আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে থাকে।

কখন কলেজের ছাত্রসভায়, কখন আলোচনা সভায়, কখন মিছিলের অগ্রভাগে, কখন ছাত্রদের পথসভায়, কখন বা প্রেসে হ্যান্ডবিল অথবা ব্যাজ ছাপার জন্য প্রুফ দেখায় মুখতার অত্যন্ত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে থাকে। ইতিমধ্যে মুখতার শহরের নিকটস্থ গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীকে ব্যাপকতা দান করে। এ কারণে সমগ্র বাংলাদেশ যখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মুখরিত এই সময় রংপুর যে কয়জন ছাত্রনেতাদের অবদান অবস্মরণীয় তাদের মধ্যে মুখতার প্রথম সারির একজন তা অনস্বীকার্য।

এভাবে রংপুরসহ সমগ্র দেশ যখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রত, ছাত্ররা ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিতে সোচ্চার, আগরতলা মামলা প্রত্যহারের জন্য ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন তখন স্বৈরাচার শাসকবর্গের গদি দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। অগত্যা পথ না পেয়ে আইয়ুব শাহী সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন রাজবন্দীর বিনা শর্তে মুক্তি দেয়।

২২শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় ইতিহাসের এক অবস্মরণীয় দিন। এই দিনেই আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা সংগ্রামের মাধ্যমে প্রথম সামরিক সরকারের পরাজয় ঘটায়। শেখ মুজিবসহ ৩৫ আসামির মুক্তি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দুঃশাসনের প্রথম পরাজয় এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রথম বিজয় বলে অভিহিত করা যায়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান বাধ্য হয়েই আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। ছাত্রদের জন্য নানান সুবিধা, যেমন, সিনেমার টিকিট, ট্রেনের টিকিট অর্ধেক মূল্যে দিয়েও আন্দোলনের রোষানল থেকে মুক্তি পান নাই। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের গতি অনুভব করে পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুব

সরকার ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানকে ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত করেন।

আমরা, বাংলাদেশ স্বাধীনতা কমিটির সদস্যরা গোপনে আলাপ আলোচনা চালাতেই থাকি। প্রতি রবিবারে বাংলাদেশ স্বাধীনতা কমিটির মিটিং আহ্বান করি। এরকম এক মিটিং চলাকালে মোহাম্মদ আলী মুনসেফ ভাই যোগ দেন। তার কিছুক্ষণ পরে মনোয়ার ভাই এবং মকবুল মাষ্টারও আমাদের সভায় যোগ দেন। সভায় চা চক্রের মধ্যে আইয়ুব খানের পদত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে মুখতার আইয়ুব খানের পদত্যাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলল যে, এই আন্দোলনের সার্থকতায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা কমিটির প্রথম ধাপ উত্তোরণ হলো।

স্বাধীনতার জন্য আমাদেরকে আরও অনেকটা পথ চলতে হবে। আরও অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। এই আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সকলেরই প্রস্তুত থাকতে হবে। মোহাম্মদ আলী মুনসেফ এবং মনোয়ার ভাই আমাদের এই সভা-সমাবেশ সম্পর্কে পাড়ার লোকদের মনোভাব জানতে চাইলেন। আমি নির্দ্বিধায় জানলাম যে, পাড়ার সবাই এটাকে নেয়াহেতে কলেজ ছাত্রদের আড্ডা বলে মনে করে। আমরা যে এখানে রাজনৈতিক আলাপচারিতা করে থাকি পাড়ার কেউইতো মনে করে না। একে একে সবাই পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে চলে যান। মনোয়ার ভাই ও মুনসেফ ভাই স্বীকার করলেন যে মুখতার আইয়ুব খানের পরাজয়ের যথার্থ মূল্যায়ন করেছে।

কারমাইকেল কলেজ ছাত্র লীগ কর্মীসভায় সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা জনমত তৈরির জন্য প্রতিটি কর্মী মাঠে-ময়দানে হাটে-বাজারে ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে ব্যাপকভাবে কাজ করবো। সেই সংগে মুখতার ও আমি হারেছ ভাইয়ের সংগে দেখা করি। হারেছ ভাইয়ের সংগে আলোচনার এক পর্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলার কথা বলি। হারেছ ভাই আগামী নির্বাচন বিষয়েও আমাদেরকে অবহিত করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে আমাদেরকে কাজ করার অনুরোধ জানান। সমগ্র দেশে আওয়ামী লীগ কর্মীরাই জনসভা করার প্রস্তুতি নেয়। আমরাও আওয়ামী লীগের জনসভায় বক্তব্য দেই। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকি।

কলেজ সংসদ নির্বাচন ১৯৭০-৭১ এবং দেশের রাজনীতির গতিধারা

কলেজ নির্বাচন ও আসন্ন ছাত্র লীগ কারমাইকেল কলেজ শাখার নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকি। ১৯৭০-৭১ শিক্ষা বৎসরের নির্বাচনে ভিপি পদে মুখতার ও জিএস পদে আকবর প্যানেল সাব্যস্থ হলো। একদিকে কলেজে ছাত্র লীগ প্যানেলের জন্য কর্মীসভা এবং ছাত্রদের সংগে মতবিনিময় অপরদিকে বদরগঞ্জ, লালমনিরহাট, মিঠাপুকুর ও বিভিন্ন জায়গায় কারমাইকেল কলেজের ছাত্রদের সংগে জনগণের খোলাখুলি বৈঠক আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়। মুখতার অতীব ব্যস্ততার মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে থাকে। আগেই বলেছি যে সেই সময় মুখতারই পোষ্টার লিখত। মুখতার আমার টেবিলে পোষ্টার তৈরি করে দৃষ্টি নন্দন ডিজাইনে। পোষ্টারের সংগে সংযুক্ত হয় জীবনান্দ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান এবং কবিতার পংতি, সেই সংগে নানা বর্ণের কালি দিয়ে আধুনিক আর্ট সংযুক্ত করা। পোষ্টারের মান শিক্ষকদের কাছেও যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে।

আমি এবং শরিফুল ইসলাম (মকবুল) অতি প্রত্যুষে পোষ্টার নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে আসি, কোন কোন দিন মুখতারও আমাদের সংগে যোগ দেয়। যেদিন মুখতার থাকে না সেদিন আমি ও শরিফুল পোষ্টার লাগিয়ে বাসায় ফিরে আসি এবং পরে আমরা আবার কলেজ যাই। যেদিন মুখতার আমাদের সংগে থাকে সেদিন আর বাসায় আসা হয় না। লালবাগে ননী গোপালের দোকানে নাস্তা খেয়ে আমরা আর বাসায় ফিরি না। একবারে কলেজে ক্লাস করে বাসায় ফিরি। যাইহোক, সারাদিন নির্বাচনের জন্য ক্লাসে ক্লাসে বক্তৃতা দেয়া, ছাত্রদের সংগে আলোচনা করা, তাদের মতামত অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনায় বসা, সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়, কলেজ উন্নয়নের জন্য আমরা কি করতে চাই তার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রতি ছাত্রদের আস্থা অর্জন লক্ষ্য করে আমাদের প্যানেলের জয় নিশ্চিত ভেবেই নিয়েছিলাম। সত্যি সত্যি নির্বাচনে ছাত্র লীগ প্যানেল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে মুখতার ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভিপি নির্বাচিত হয়।

অন্যদিকে, সামরিক সরকার অক্টোবর ১৯৭০-এ সারা পাকিস্তান একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আশ্বাস প্রদান করে। নির্বাচনের আশ্বাসের ফলে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ জোরে-শোরে তাদের কর্মকান্ড শুরু করে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জেলায় জেলায় গণ-সংযোগ কর্ম শুরু করেন এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের সংগে আলোচনায় ছাত্র লীগও ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কিন্তু প্রবীণ নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

বলতে লাগলো ঃ 'আগে ভাত পরে ভোট', কিন্তু আওয়ামী লীগের দাবী ঃ 'ভোট চাই ভাতও চাই'।

দুঃখের বিষয় বন্যার কারণে প্রথমে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং পরবর্তিতে প্রচন্ড সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বঙ্গের আট থেকে দশ লক্ষ লোক মারা যায়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে শোকের ছায়া নেমে আসে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহয্যের জন্য ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে। রংপুরের ছাত্র লীগ কর্মীরাও সর্বাত্মকভাবে নানান ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। জাকির হোসেন এবং সাবু ভাই গলায় হারমনিয়ম বেঁধে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য গান গেয়ে সাহায্য সংগ্রহ করেন। আমরা সাবু ভাইয়ের মিছিলের সংগে রাজপথে থাকি। ছাত্র লীগ শুধু নয় বাংলার সমস্ত ছাত্র সংগঠন দুঃস্থদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করতে থাকে। তাঁরা বাসায় বাসায় গিয়ে অর্থ, কাপড়, চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। দেশের মানুষ, বিশেষ করে, রংপুরের মানুষ যেন দুই হাত উজাড় করে ছাত্র লীগের মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করে তা ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠিয়ে দেয়। এই সময় ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতারা যথেষ্ট সততার পরিচয় দেন এবং মুখতার ইলাহীও তাঁদের একজন। মুখতারের নেতৃত্বে আমরা অনেকের কাছ থেকে চাঁদা উঠাই। মুখতার সার্বক্ষণিক নেতাদের সংগে সংযোগ রক্ষা করতো। কর্মীরাও মুখতারের সংগে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করতো এবং সংগৃহিত অর্থ জমা দিত। ছাত্রসমাজ রংপুরের জনগণের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। ছাত্রসমাজের কার্যক্রমে জনগণ খুবই আশ্বস্ত ছিল।

অনেক রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে শেষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে সামরিক সরকার সাধারণ আবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। মুখতার আমাদেরকে নিয়ে নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থীর সংগে দেখা করে এবং তাদের এলাকায় কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তাঁরাও আমাদেরকে খুবই উৎসাহ যোগায়। মূলতঃ আওয়ামী লীগের ১৯৭০-এর নির্বাচনে ছাত্ররাই ছিল মূল প্রাণ শক্তি।

পীরগঞ্জে ডাঃ সোলায়মান মন্ডল, রংপুরে সিদ্দিক ভাই, মিঠাপুকুরে এ্যাডঃ জামাল ভাই, এ্যাডঃ নূরুল হক, আজিজার রহমান এবং আরও অনেকেই আওয়ামী লীগের ব্যানারে প্রার্থী হয়েছিলেন। মুখতার আমাদের সংগে নিয়ে বিভিন্ন জনসভায় যেতো। কখনো কখনো খুলি-বৈঠক, কখনও কর্মীসভা করে যেমন ছাত্র লীগ কর্মীদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাতো, তেমনি জনতার সংগে কথা বলে আওয়ামী লীগের প্রচার কার্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন করতো। ছাত্র লীগ কর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে জনমত তৈরি করতো। আমার দেখা মতে ১০০% ছাত্রই আওয়ামী প্রার্থীদের জন্য কাজ করে। জনতা ছাত্রসমাজের প্রতি খুবই আস্থাশীল ছিল। তারা ছাত্রদের কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতো। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ আমাদের

প্রতি কি ধরনের আচরণ করে সর্বত্র বাঙালীদের সংগে তারা বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, চাকুরির ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বত্র বাংগালীরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ দ্বারা নিগৃহিত হচ্ছে - এই সব কথায় জনগণ আমাদেরকে কথা দেয় যে তারা আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবে। আওয়ামী লীগের ভোটের মার্কা নৌকা। সবারই একই কথা ঃ 'এবার চড়বো নৌকায় যা করে আল্লাহ্য়'।

মুখতার এবং আমি আউয়াল সাহেবের কাজ করার জন্য হারাগাছ যাই। সেখানে আমাদের বন্ধু নজরুল এবং আনিস বিএসসি অনেক কর্মীদের সংগে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলো। তারা আমাদেরকে জানালো যে, এখানে সবাই নৌকা। ছাত্রদের প্রচারণায় এমন অবস্থা সৃষ্টি হল যে কেন্ডিডেট কে তা জানার দরকার নাই, শুধু নৌকা আর নৌকা। মুখতারের সংগে বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর এবং আরও অনেক জায়গাতেই আমি গিয়েছি কিন্তু তাকে কখনও কারো কাছে এক কাপ চাও খেতে দেখি নাই। খরচ করতাম আমরা - বাসা থেকে যে দুই-চার টাকা নিয়ে যেতাম তাই দিয়ে বরং উল্টো আমরাই কর্মীদেরকে কখনো কখনো চা-বিস্কুট খাওয়াতাম। অবশ্য তখন এক কাপ চায়ের দাম ছিল কোথাও এক আনা, কোথাও দুই আনা। দুই আনার টোষ্ট বিস্কুট কিনলে ৪/৫ জন খাওয়া যেত। মুখতারের সংগে নির্বাচনে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম মানুষ ছাত্রদের প্রতি কতটা স্নেহশীল যে তারা মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারে বা মিথ্যা কথা বলতে পারে এটা ভাবতেই পারেনা। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি আপনাদের এলাকার প্রার্থীর নাম কি? উত্তরে বলেছে প্রার্থীর নাম দরকার নাই, আমরা ভোট দিব নৌকায়। সর্বত্র নৌকা নৌকা রব উঠে গেল। এই রব উঠানোর পিছনে আমার বিশ্বাস যদি কারো একক প্রচেষ্টা থেকে থাকে তা হল তৎকালীন বাংলার ছাত্রসমাজ। তাদের নিষ্ঠা তাদের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সত্যি সত্যি ৭ ডিসেম্বর নির্বাচণের ফলাফল তার প্রমাণ। নির্বাচনে গণপরিষদে ১৬০টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। এই আসন লাভের ফলে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু সামরিক সরকার নানাভাবে গণতান্ত্রিক প্রথাকে পদদলিত করবার চক্রান্ত শুরু করে দেয়।

নির্বাচনের পর থেকেই রংপুর শহরের অবাঙ্গালীদের ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তাদের চালচলনে কথাবার্তায় এক ধরনের অসামাজিকতা। একদিন মুখতার আমাকে বলল একটা বিহারী ছেলেকে লাঞ্ছিত কর দেখি কি ফল হয়। যেমন কথা তেমনি কাজ। আমরা কলেজ কেন্টিনে গিয়ে দেখি সাহাদত-এর ছোটভাই মঈন বসে আছে। আমি টেবিলের উপর পানির গ্লাসটা ফেলে দিয়ে মঈন সংগে দুর্ব্যবহার করলাম। মঈন ছাত্র লীগের নেতাদের কাছে বিচার দিলে শহর থেকে হারেছ ভাইসহ আরও দুই-একজন কলেজে আসলেন। আমাকে অলোক দা,

বারি ভাইসহ আমাদের বিচার হলো যে কাজটা ভাল হয় নাই, মঈন ছাত্র লীগ জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ। যা হোক হয়ে গেছে বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দিলেন। এখনও মঈন ভাইয়ের সংগে আমার দেখা হলে বিব্রত বোধ হয়।

প্রতিরোধ থেকে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি

মুখতার আর আমি আমাদের এক বন্ধুর দোকান থেকে ১০-১৫টা ভিটাকোলার বোতল সংগ্রহ করলাম। মুখতার বললো, আরও কয়েকটি বোতল সংগ্রহ কর। আমরা অন্য এক দোকান থেকে আরও ১০-১২টি বোতল কিনলাম। সেই সময়ে এই কাঁচের বোতল বিক্রয় হতো না। একান্ত আমাদেরকে অবজ্ঞা করতে না পারার কারণেই আমাদেরকে বোতলগুলো দিয়েছিল।

মুখতার কলেজের নাইট গার্ড মোসলেম-এর সাথে আগেই একটি বিষয়ে কথা বলে রেখেছিল। আমরা ব্যাগে করে রাত ৯টার দিকে কলেজে গেলে মোসলেম টিচার্স কমন রুমের তালা খুলে দিল। টিচার্স কমনরুমের ভিতর দিয়ে ছাদে উঠার সিঁড়ি। মোসলেম ব্যাগটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে অধ্যক্ষের রুমের উপরে যে চিলেকোঠা তার ভিতর রাখলো। আমি বুঝলাম যে মুখতারের সাথে তার আগেই কথা হয়েছিল। মুখতার বললো এখন পেট্রোল সংগ্রহের দরকার। বিধি-নিষেধের কারণে মটর সাইকেল ছাড়া কেউ পেট্রোল দিতে রাজি নয়। অনেক চেষ্টার পরেও দুই-এক গ্যালনের বেশি পেট্রোল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই মুখতার হারেছ ভাইয়ের সাহায্য চাইলো। জাহাজ কোম্পানী মোড়ে মোতাহার চৌধুরী বাড়ির সামনে সোনা মিয়ার গ্যারেজ। রাত ১০টার দিকে হারেছ ভাই সোনা মিয়ার গ্যারেজ থেকে আমাদের দুই টিন পেট্রোল বের করে দিলেন। আমরা রিকসায় করে রাত ১০টার পরে কলেজে গিয়ে চিলাকোঠায় পেট্রোল রেখে এলাম। পরের দিন কলেজ বন্ধ, আমরা সকালে গিয়ে সেই পেট্রোল দিয়ে বোমা তৈরি করলাম। পেট্রোল বোমা তৈরির উপকরণ মুখতারের জানা ছিল।

৩রা মার্চ ১৯৭১, গণপরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। তা আর হচ্ছে না শুনার সংগে সংগে গোটা দেশের মানুষ অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। এই দিন রংপুরের আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের ডাকে হাজার হাজার লোকের মিছিল হয়। আমাদের মিছিলের সম্মুখভাগ যখন শাপলা চত্ত্বরে (তখন ভাটিখানা মোড়) তখন অনেকেই মিছিলটি স্টেশনের রাস্তা ধরে যেতে বললেন। ষ্টেশনের পথে যাওয়ার সময় ঘোড়া পীরের মাজারের সম্মুখে বিহারী ব্যবসায়ী ইসলাম সাহেবের বাড়ি। সেই বাড়ির ছাদের উপর থেকে হঠাৎ মিছিলের উপর গুলি শুরু হয়। গুলিতে শংকু নামের এক কিশোর মারা যায়। এখানেই শরিফুল ইসলামের (মকবুল)

পায়ে গুলি লাগে। তিনি আহত হন। মুখতার শরিফুলকে নিয়ে রিক্সায় করে সদর হাসপাতাল চলে যায়। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে অনেকে আবার ইসলামের বাড়ি আক্রমণ করার চেষ্টা করে। মুখতার হাসপাতালেই যাওয়ার সময় আমাকে কলেজে যাওয়ার জন্য বলে গেলো। আমরা কলেজে যেতেই মুখতার শরিফুলের রক্ত মাখা কাপড় নিয়ে কলেজে আসে। চিলেকোঠা থেকে পেট্রোল বোমাগুলো মোখতার অনেকের হাতে হাতে দিল এবং রক্ত মাখা কাপড় নিয়ে শহরের দিকে মিছিল আসতে শুরু করলো। রাস্তায় সাত্তার সাহেবের চাউলের মিল সেখানে পেট্রোল বোমা মারা হলো। এদিক শহরের অন্যত্র গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। লুটপাট হচ্ছে অনেক স্থানে। শহরে আইন শৃঙ্খলা বলে আর কিছু রইলো না। প্রশাসন কারফিউ জারি করে। আমরা শহর থেকে সদলবলে কলেজে ফিরে গেলাম।

বিকেল ৪টার দিকে আমরা সবাই কেনটিনে বসে আছি এমন সময় একটা জিপ এবং পিছনে একটা বড় ট্রাক লালবাগ হাটের গা ঘেঁসে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই কালো পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী সৈন্যরা রাস্তার পাশের নিচু জায়গায় অস্ত্র তাক করে শুয়ে পড়লো। মুখতার, মাহবুবুর রহমান বাবু এবং আরো অনেকেই কেনটিনের ছাদের বাঁশ খুলে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। কারমাইকেল কলেজের এখন সেখানে কেনটিন এবং লাইব্রেরি তখন সেখানে কিছুই ছিলনা। এটা সম্পূর্ণ ছিল ফাঁকা জায়গা। বেগতিক দেখে আমি মুখতারকে বাধা দিলাম, মুখতার আর বাবু আমার সংগে ধাক্কা-ধাক্কি করতে থাকে। তবুও জোর করে আমি ওদেরকে কেনটিনে নিয়ে আসি। সৈন্যরা কি মনে করে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে চলে যায়।

শহরে কারফিউ, বাড়ি আসার কোন উপায় নাই। দুপুরে খাওয়া নেই, রাত্রিতে খাওয়ার উপায় কি? মুখতার সবাইকে কে. বি. হোস্টেল এবং জি. এল. হোস্টেলে যদি কিছু খাবার থাকে খেয়ে আসতে বললো। ঠিক হ'ল সে রাত্রে হোষ্টেলে থাকার দরকার নাই। রাত্রি ১২টার দিকে নাইট গার্ডদের কাছ থেকে কম্বল নিয়ে কমার্স বিল্ডিং-এর দোতালায় পিছনের রুমে সবাই রাত্রি যাপন করলাম।

খুব সকালে মুখতার ও অন্যান্যরা কেনটিন ম্যানেজারকে ডেকে নাস্তা বানানোর জন্য রাজি করায়। যখন ছাত্ররা কেবল দুই-একটা করে পুরি মুখে দিয়েছে অমনি এক ট্রাক মিলিটারি এসে কেনটিন আক্রমণ করলো। সিপাইরা রাইফেলের বাট দিয়ে যাকে যেখানে পেয়েছে পিটানো শুরু করে। কেনটিন ছিল বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া। বেড়া ভেঙ্গে যে যেদিকে পায় দৌড়। জি. এল. হোষ্টেলের বেশ কিছু ছাত্র আহতবস্থায় পড়ে থাকে সামনের পানিয়াল গাছের তলায়। এই পনিয়াল তলা কারমাইকেল কলেজের এক ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গা। মুখতার

একজন স্যারের বাসা থেকে হাসপাতালে ফোন করলে এ্যামবুলেন্স এসে আহতদের নিয়ে যায়।

কারমাইকেল কলেজের প্রধান ভবনের সামনে ফুলের বাগান। সেই বাগানের মালী ছিল আমাদের বন্ধু মতিনের বাবা, কলেজ ক্যাম্পসের ভিতরে থাকত। তার পরিবার এখানো ওখানেই আছে। সে বোমা বানাতে জানতো, মুখতার মালী সঙ্গে কথা বলে বোমা বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। মালী তাকে উপকরণের কথা বললে কলেজ ল্যাবরেটরিতে সবই আছে বলে সে জানালো। মুখতার অলোক দা, মাহবুবুল বারী এবং মাহাবুবুর রহমান বাবু আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলো যে আজ রাত্রেই কলেজ ল্যাবরটারির দরজা ভেঙ্গে উপকরণগুলো সংগ্রহ করবে। অলোক সরকার কেমেস্ট্রি অনার্স-এর ছাত্র। ল্যাবরেটরিতে কোন জিনিস কোথায় আছে তা তার জানা ছিল। রাত্রে ১১-১২টার দিকে কলেজ ল্যাবটারির তালা ভেঙ্গে ফসফরাসসহ অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হলো। পরের দিন নাইট গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আর উৎসাহ দেখান নাই - সঙ্গত কারণেই। আমরা উপকরণগুলি মালীকে দিলে সে আমাদেরকে যথাসময়ে বোমাগুলি সরবরাহ করেছিলো।

পরের দিন কারফিউ তুলে নেয়ার সাথে সাথেই ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগের প্রধান সারির নেতাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে এক বিরাট মিছিল বের করে। ডাঃ সোলায়মান মন্ডল, শাহ আব্দুর রাজ্জাক, সিদ্দিক হোসেন, এডঃ নুরুল ইসলাম, এডঃ আজিজুর রহমানসহ অন্যান্যরা মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। মিছিল মাহিগঞ্জ দিয়ে তাজহাট, তাজহাট হয়ে আবার শহরের দিকে রওনা হলো। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত 'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ'। 'আওয়ামী লীগের দফা মানতে হবে'। '৬ দফা ও ১১ দফা মানতে হবে', 'গণপরিষদের সভা ডাকতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগান চলছে সর্বক্ষণ। মিছিলটি যখন ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে মুখতার আমাকে বললো এখন শ্লোগান হবে ৬ দফা দাবী ১১ দফা নয়, 'এক দফা স্বাধীনতা স্বাধীনতা'। নেতারা অনেকেই মানা করলে আমি নুরুল হক স্যারের গলায় মালাগুলো এক টানে ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর গোটা শহর জুড়ে মিছিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শ্লোগান - '১ দফা স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' চলতে থাকলো।

আমরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। আমার বাসা থেকে সোনয়ার ভাইয়ের বাসার দূরত্ব ২০০-৩০০ গজের বেশি নয়। ওনার বাসার ওপারে সেনপাড়া আর আমার বাসা সড়কের পাড়ে গুপ্তপাড়া। সকাল ৯টার দিকে সোনয়ার ভাই বাসায় এলেন। বললেন যে তোহা ভাই ঢাকা থেকে আসবেন। মুখতারসহ আমি যেন ১০টার দিকে সোনয়ার ভাইয়ের বাসায় যাই। মুখতার আর আমি রাত ১০টার সময় ওনার বাসায়

গিয়ে দেখি মুনসেফ ভাই, মকবুল মাষ্টার এবং তোহা সাহেব সেখানে। তোহা সাহেবের সাথে আলাপচারিতার সময় মুনসেফ ভাই আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনেক কথাই বললেন, প্রসঙ্গক্রমে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং শেখ মুজির সম্পর্কেও নানা ইতিবাচক-নেতিবাচক কথাও বললেন। আমরা তাকে সাফ জানালাম যে, আমরা স্বাধীনতা চাই। সে জন্য যা করা দরকার আমরা তাই করব। আমাদের কথায় মুনসেফ ভাই খুবই খুশি হলেন।

রংপুরের রাজনীতি উত্তপ্ত। নেতারা সবাই কি হতে যাচ্ছে বলতে পারছেন না। আমরাও যেমন বুঝি ওনারও সেই রকমই। সবার মধ্যে উদ্বিগ্নতা। ডাঃ সোলায়মান মন্ডল আমার বাসার সামনে থাকেন। আশেক আলী ডাক্তার সাহেবের জামাই। আমার কাছে জানতে চান ছাত্র লীগ কি ভাবছে। আমি সরাসরি জানালাম যে আবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করছে। আমাদেরকে যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। এখন আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য। আমি ওনাকে অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনের কথা জানালাম। পরের দিন সন্ধ্যার পর মুখতার আর আমি ডাঃ সোলেমান সাহেবের সংগে দেখা করলাম। আমি ওনাকে দুলাই বলে ডাকতাম। উনি নিজের লাইসেন্স করা পিস্তল আমাদেরকে দেখালেন এবং কি করে গুলি লোড করতে হয় তাও শিখালেন। আমি আর মুখতার দুই রাউন্ড গুলিও ছুড়লাম। প্রয়োজনে আমাদেরকে পিস্তলটি দিতে রাজি হলেন।

মুখতারের এক ইপিয়ার সদস্যের সঙ্গে খুবই সখ্যতা তৈরি হয়েছিলো। যতদুর মনে হয় তখন ইপিয়ার ক্যাম্প ছিল তাজহাট রাজবাড়িতে। মুখতার তার সংগে অস্ত্রের কথা বললে জানালো যে, যদি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায় তবে মুখতারকে সে একটি অস্ত্র দিতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তাকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য পথ খরচ ১০০ টাকা দিতে হবে। মুখতার আর আমি অতি কষ্টে ৮০ টাকা সংগ্রহ করলাম কিন্তু কিছুতেই আর ২০ টাকা সংগ্রহ করতে পারি না। শেষে সিদ্ধান্ত হল যে আমার আঙ্গুলের সোনার আংটি দুইটি বন্ধক রেখে বিশ টাকা সংগ্রহ করবো। গুপ্তপাড়ায় একমাত্র স্বর্ণকার কিরণ বাবুর বাবা, তাকে আমরা অনুরোধ করি। তিনি আংটি দুটি দেখে প্রথমে ১৫ টাকা দিতে সম্মত হন কিন্তু আমাদের অনুনয়-বিনয় দেখে শেষে ২০ টাকা দিতে রাজি হন। স্বাধীনতার পর তার কাছ থেকে আংটি ফেরত নিতে গেলে তিনি তা আর ফেরত দিতে পারেন নাই। মুখতার ইপিআর সেনাকে ১০০ টাকা দিয়েছিল।

আমরা দুইজন একদিন সদর হাসপাতালে আহত শরিফুল (মকবুল)'কে দেখতে যাই। হাসপাতালে ডাক্তার নাই, এক নার্সের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে যত্নের কোন অভাব হবে না। কিন্তু আমরা হাসপাতালের যে চিত্র দেখলাম তাতে মনে হয় যে কারো কাজের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ নাই, সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক, কেউ

কারো সঙ্গে দায়সারা কথা বলা ছাড়া কোন দায়িত্বের পরিচয় দিতে পারছেন না। মুখতার শরিফুলের জন্য খুবই অনুশোচনা করলো। আমাদের মাঝে মাঝে এসে দেখা যাওয়া দরকার, তা হলে শরিফুল আরো সাহস পাবে। মুখতার শরিফুলকে খুবই স্নেহ করতো যদিও মুখতার প্রতিটি কর্মীর প্রতি খুবই স্নেহপরায়ণ ছিলো কিন্তু কতর্ব্যপরায়ণ প্রতিটি কর্মী তার কাছে মহামূল্যবান। সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মীদের প্রতি মুখতারের অবাধ ভালবাসা, প্রতিটি ছোট বড় কাজেই তার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সে কাউকে সন্দেহ করতো না। সবাই তার আপন কিন্তু কোন কাজে অবহেলা সে কখনই সহ্য করতো না। কর্মীদের কোন কাজে অবহেলা বা অবজ্ঞা ছিলো তার কাছে অসহ্য। মুখতারের সঙ্গে যুদ্ধে ট্রেনিং নিয়েছে অথবা সহচার্যে ছিলো কেবলমাত্র তারাই এসব গুণাবলী সম্পর্কে আরও বলতে পারবেন। মুখতারের মধ্যে জটিলতা বা কুটিলতা ছিল না। প্রতিটি কর্মীকে অগাধ বিশ্বাস করতো। কেউ তার সাথে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তার নেতৃত্ব সম্পর্কে কেউ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, এমন ভাবনা কখনই তার মনে উদয় হতো না।

৭ই মার্চ ১৯৭১। আওয়ামী লীগের ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। জনসভায় ভাষণ দেবেন শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান রেডিও'র প্রচার করার কথা ছিল এই ভাষণ। আমি ও মুখতার একটি টু-ইন-ওয়ান রেডিও নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সামরিক সরকার ভাষণটি প্রচার করতে দিলো না। তবে পরের দিন সকালের খবরের পর পাকিস্তান রেডিও শেখ মুজিবের সেই ভাষণ সম্প্রচার করে। মুখতার শেখ মুজিবের ভাষণটি টেপরেকর্ডভূক্ত করেছিল। সকাল ১০টার দিকে মুখতার টু-ইন-ওয়ানসহ আমার বাসায় আসে। আমরা দুই জন সেই সময়কার রংপুরের রেষ্টুরেন্ট, যেমন গ্রীণ হোটেল, হক হোটেল, রহমানিয়া হোটেল, গুলশান হোটেল এবং কাঁচারি বাজারে পিয়াসি হোটেল গিয়ে বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দেই আর টেপ ছেড়ে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার করে দেই। মানুষ আগ্রহের সাথে সেই ভাষণ শোনেন। সেই দিন আমরা রংপুরের প্রায় প্রতিটি চায়ের দোকানে টেপ বাজিয়ে মানুষকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনাই।

কারমাইকেল কলেজে ডামি বন্দুক ছিল তখনকার UOTC সদস্যদের। আমরা ৩০-৪০ জন ছাত্র এসব বন্দুক নিয়ে মহড়া শুরু করে দেই। গোটা রংপুর শহরে যেন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। সবার মধ্যে আতঙ্ক অনেকেই আবার পরিবার পরিজনকে গ্রামে পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছিল। অবাঙ্গালীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। আওয়ামী লীগের নেতারাও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে তাদের সম্পর্কে। ডাঃ সোলায়মান মন্ডল তার ব্যবহারের অস্ত্রটাও আমাদেরকে দিয়েছিলেন যা আমাদের কাছে ১১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত ছিল। পরে উনি আমার কাছ সেটা থেকে ফেরত নেন এবং প্রয়োজনে আমরা চাইলে আবার দিবেন বলে ওয়াদা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন, কারফিউ, হরতাল খন্ড, মিছিল - ছাত্রদের মধ্যে ডিসপেরেট ভাব, জনতার মধ্যে অস্থিরতা অফিস, আদালত-স্কুল-কলেজে দায়সারা কাজ। অস্থিরতা ও আতঙ্ক জেলা শহরের প্রতিটি পাড়া মহল্লায়। রাত্রে থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীনতা কমিটি ১০ই মার্চ বিকাল ৪ টায় আমার বাসায় মিটিং আহ্ববান করলো। মিটিং-এ প্রায় সব সদস্যই উপস্থিত। মুখতার আলোচনার সময় বলল যে আয়ুব সরকারের সামরিক শাসন পরিসমাপ্তী আমাদের প্রথম জয়। দ্বিতীয় জয় আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয়। এবার আমাদের সর্বশেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের যেখানে পারি তার জন্য জীবনপন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। হয়তোবা কমিটির এটাই হবে শেষ মিটিং। এই সভায় মুখতার ইলাহী আমাকে একটি ব্লেড আনতে বললো। ব্লেড এনে দিলাম। মুখতার প্রথমে তার এক আঙ্গুল কেটে রক্ত বের করলো। আমরা হকচকিয়ে গেলাম। মুখতার বললো এই রক্ত শপথ করছি দেশ স্বাধীন করবো। তোমরা সবাই নিজের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা শপথ পত্রে চিহ্ন রেখে শপথ কর। আমরা মুখতারকে অনুসরণ করে দৃঢ় চিত্তে তাই করলাম। এরপর মুখতারের নির্দেশ দিল: এখন আমাদের করণীয়, আমরা আমাদের এলাকার যুবকদেরকে নিয়ে বসবো। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার কথা মুখতার বললা। আমার দায়িত্ব গুপ্তপাড়া ও আমার মহল্লা। নুরুল রসুল কলেজ রোড, কুদ্দুস ধাপ। এইভাবে সবাইকে নিজ নিজ মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে প্রতিরোধ অনুশীলনের জন্য আহ্বান করল। তার কথা মত আমি গুপ্তপাড়া মহিলা সমিতি অঙ্গনে কিরণ, সিরাজুল, লেবু, বাদশা, গোপাল, হারাধন, বাবুদেরকে নিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে অনুশীলন শুরু করলাম। সবাই নিজ নিজ মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তুতির কথা বললো।

আমরা এক দিকে কলেজে ডামি বন্দুক দিয়ে অন্যদিকে মহল্লায় তরুণদের লাঠি নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। উল্লেখ্য, যে আমরা কোন সময়ে একই স্থানে কর্মীদের নিয়ে সভা করতাম না। কারমাইকেল কলেজের বিশাল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবন ছাড়াও দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা চাষাবাদী জমি (যেখানে এখন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়) একটি নিরাপদ গোপন সভার স্থান ছিল সমগ্র উত্তাল ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত। রাজনৈতিক অবস্থা দিন দিন উত্তপ্ত হতেই লাগলো। সামরিক সরকারের বার বার আলোচনা বসার কথা বলে সময় ক্ষেপণ শুরু করলো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগে নেতাদের উৎকণ্ঠাও বাড়তে শুরু করলো। ছাত্ররা বাঁধ ভাংগা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল দেশব্যাপী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে লিফলেট বের করা হয়েছে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। এই লিফলেট রংপুরের ছাত্রনেতাদের হাতে পৌছালে ছাত্র নেতারা রংপুর

কলেজের সেন্ট্রাল রোডস্থ পাঙ্গা নামে একটা ছাত্রবাসে আলোচনায় বসে। প্রথম সারির ছাত্র লীগ নেতা - হারেছ ভাই, জাকির হোসেন সাবু ভাই, গোলাপ ভাই, অলোক সরকার এবং ইলিয়াছ আহমদ সবাই উপস্থিত ছিলেন। মুখতার আমাকে কলেজের মালীর কাছে থেকে একটি বোমা আনতে বলে মিটিং এ চলে যায়। আমি মালীর কাছ থেকে বোমাটি নিয়ে আসি। মালী বোমাটির ব্যবহার দেখিয়ে দিল। বোমার একদিকে সলতাটিতে আগুন লাগিয়ে সরে যেতে পরামর্শ দিলো। আমি বোমাটি মুখতারকে দেখালাম। মুখতারের নির্দেশ মত আমি পাঙ্গা ছাত্রাবাসের খোলা মাঠে রেখে সলতাটিতে আগুন লাগিয়ে দিলাম, সলতাটি ধিরে ধিরে পুড়তে শুরু করে দিল। কিন্তু বোমাটা ফুটছেনা ভেবে আমাকে দেখতে বললো। আমি দেখে এসে বললাম যে আগুন একেবারে গোড়ায় গেছে। তার দুই-এক মিনিট পরেই মুখতার অসহ্য হয়ে বোমাটার দিকে এগিয়ে গেল। মুখতার বোমটার কাছে পৌঁছাবার আগে প্রচন্ড শব্দ করে বোমাটি ফুটে উঠলো। এতে করে মুখতারের মুখমন্ডলের বাম দিকটায় কয়েকটি স্পিলিন্টার এসে লাগায় মুখতার আহত হয়। অলোকদা মুখতারকে রিকসায় করে হিরণ ফার্মেসীতে নিয়ে যায়। সেখানে নেপাল নামের এক কমপাউন্ডার তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে। ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন, প্রায়ই এই গল্প করে গর্ব অনুভব করেন।

প্রায় প্রতিদিনই কারফিউ, শহরের মানুষজন আতংকিত। পাকসেনারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র মেশিনগানসহ কনভয় নিয়ে শহরে নিয়মিত চলাফেরা করে। নিরাপত্তাহীনতা রংপুরবাসীকে গ্রাস করে ফেলেছে যেন। এদের সহায়তায় শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের অনেক বাড়ীতে অবাঙ্গালী/বিহারীরা লুটতরাজ চালিয়ে যায় প্রায় নিয়মিত। চারিদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব, কেউ স্বস্তিত্বে নাই। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে কারফিউর গুমোটবাধা পরিবেশ। উপরোক্ত কারণে দামোদরপুর বাজারে পাকবাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্বাসীকে গ্রামবাসী অপদস্ত করে, তার সংগে কয়েকজন সাধারণ সিপাইও ছিল। জনতার এই ঘটনা পাক সেনাদের উত্তেজিত করে তুলে ফেলে, শহরে সামরিক যানবাহনের চলাফেরাও অনেক গুণে বেড়ে যায়।

২৮শে মার্চ দুপুরে আমরা কলেজ কেনটিনে বসে আছি, এমন সময় শুনতে পারলাম যে মিঠাপুকুরের জায়গীর হাটের দিক থেকে বহু লোক লাঠি, বল্লম, তীর নিয়ে রংপুর সেনা নিবাস আক্রমণ করার জন্য আসছে। আমরা লালবাগ হাটের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেক অদিবাসী সাঁওতালকে দেখেছি তাদের হাতে তীর ও বল্লম। নেই সময় লালবাগ থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় ছিল বসতিশূন্য। রেললাইনের ওপারে থেকে সম্পূর্ণ জায়গাই ছিল আবাদি জমি। তখন আর. কে. রোড হয় নাই, সেখানে ধুলোময় কাঁচা রাস্তা, পুলিশ লাইন হয় নাই, বাস টারমিনাল ভবনও ছিল না। এই জনতা লালবাগের রেল লাইন অতিক্রম করে জমির ভিতর দিয়ে সোজা সেনা নিবাসের দিকে যুদ্ধংদেহী বেগে ছুটে চলেছে।

পরে আমরা শুনতে পারলাম যে পশ্চিমে শ্যামপুরের দিক থেকেও অনেক লোক এসেছিলো সেনানিবাস আক্রমণ করার জন্য, সেই দিন সেনানিবাসের সৈনিকদের গুলিতে কয়েক হাজার লোক জীবন দিয়েছিলো। জনতার সেনা নিবাস আক্রমণ এবং আত্মহুতির ঘটনা রংপুরের ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে। এটাই রংপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে, তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম জনযুদ্ধ।

এই ঘটনার পর পরই স্থানীয় আওয়ামী লীগ শীর্ষ নেতাদের প্রায় সবাই আত্মগোপন করেন, অনেকে ভারতে যেয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার উদ্দেশ্য রংপুর ছেড়ে চলে যান। মুখতারসহ আমাদের সহকর্মীদের গ্রেফতারের হুলিয়া জারী ছিল। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ ঘটনার পর আমাদের কোন নিরাপত্তা ছিলনা। আমাদের শপথ মতো আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেই।

ব্যক্তি মুখতার ইলাহী

মুখতার শুধু সাহিত্য-সাংস্কৃতিতে নয়, খেলাধুলার মাঠেও তার ছিল অবাধ বিচরণ। তার প্রতিভার স্বাক্ষর সম্পর্কে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা, এমন কি ছোট-বড় কর্মচারীরাও স্বীকার করতো। নির্ভিক, নির্লোভ, নিরহংকারী, আত্মত্যাগী, উগ্রতাহীন ও শিষ্ট-শান্ত, সৎচরিত্র, সুস্বভাব অত্যন্ত দৃঢ়মনা এবং নীতিতে অটল মেধাবী ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র খোন্দকার মুখতার ইলাহী। অত্যাধিক কষ্টসহিষ্ণু, সুভাষী-সুবক্তা, অলংকারিক শব্দ চয়ন ও মাধুর্য্যমন্ডিত বাক্য বিন্যাস শ্রোতাদের অতি সহজেই আকৃষ্ট করে তুলতো।

সুশ্রী, হালকা দেহপল্লব, সদা মৃদু হাস্যময় কমল মুখাবয়ব মুখতার ইলাহীর বক্তৃতা শ্রোতার জানবার বসনাকে যেমন বহুগুণ আগ্রহী করে তুলতো, তেমনি বক্তৃতায় বাক্য বিন্যাস যৌবনের প্রথম পদচারণায় তাদের মধ্যে অগ্নি স্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতো। স্বাধীনতায় ব্রতী মুখতার ইলাহী - যার এক মাত্র ধ্যান, এক মাত্র সাধনা, এই সত্য-প্রত্যয় জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে সে লালন করেছিলো এবং বাস্তবে রূপ দেওয়াই ছিল তার একমাত্র তপস্যা। তার চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য - বৈপরিত্য, সহজ সরল ফুটফুটে নিরহংকার সংস্কৃতমনা মেধাবী ছাত্র মুহুর্তেই স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন। মুহুর্তেই কঠিন থেকে কঠিনতর সিদ্ধান্ত নিতে পারতো এবং তা ক্ষিপ্রতার সাথে বাস্তবায়নও করে ফেলতো। এ এক অদ্ভুত কঠিনের ও কোমলের সংমিশ্রণ। এ সমস্ত কারণে ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭১-এর মার্চ সময়কালে মুখতার ইলাহী কারমাইকেল কলেজের শিক্ষকদের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য ছাত্র নেতা ছিল, তেমনি ছাত্রদের কাছেও শ্রদ্ধাভাজন ছিল।

এই রচনায় স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে হয়তো বেশ কিছু সংগ্রামী শিক্ষক এবং আমার ও মুখতারের সহকর্মীদের নাম উল্লেখ হয়নি। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। (সৈ:জি:হ:)

শহীদ মুখতার ইলাহী'কে যেভাবে দেখেছি

সুনীল কুমার গুহ

মুখতার ইলাহী আজ একটা নাম মাত্র। কয়েকটা রাস্তা, লাইব্রেরী, ক্লাব, ব্যায়মাগার ইত্যাদির নাম। অবশ্যই, ঐ শহীদ শব্দটির দ্বারা বিশেষিত করা এক বিশেষ নামই, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েক মাস আগেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না, শহীদ কথাটা ছিল না ঠিকই, কিন্তু মুখতার ইলাহী নামটি ছিল। আর ছিল, একটি ছেলে যাকে ঐ নামে চেনা যেত।

কয়েক মাস আগেও মুখতার ইলাহী নামে একটি ছেলে ছিল। আমাদের রংপুর শহরেরই ছেলে, আমার পাড়ারই ছেলে। দেখতে ছোট খাট সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংলিশ অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। পড়াশুনায় বিশেষ ভাল ছেলে। তবে, তাও শুধু নয়। রাজনীতিবাজ ছাত্রনেতা, কারমাইকেল কলেজের ছাত্র লীগ ভি, পি, ।

আমার পাড়ার ছেলে। বলতে গেলে ওর জন্মের থেকেই আমি ওকে চিনি, এবং ওর বিষয় অনেক খবরই জানি। শুধু জানতাম না যে মুখতার রাজনীতিও করে। ব্যাপারটা যে একবারেই শুনিনি, তা অবশ্যই নয়। শুনেছি অনেকবার অনেকের মুখেই। কিন্তু বোধহয় ঠিক বিশ্বাস করিনি, তাই জানতাম, একথাও বলা চলে না। আমিও ঐ একই লাইনের লোক, মুখতারের জন্মের বহু বহু আগে থেকেই ঐ লাইনে ছিলাম এবং এখনও আছি। মুখতারের বন্ধুরা যারা রাজনীতি করে, তারা অনেকেই অনেক ব্যাপার নিয়ে আসতো আমার কাছে, অনেক আলোচনা করত, এবং সময়তে আমার সাথে সমান তালে তর্কাতর্কি করতেও তারা দ্বিধা করত না। কিন্তু মুখতার কখনও রাজনীতি নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে আসেনি। যদি বা আমি নিজেই কখনও ওর সাথে রাজনীতির কথা বলবার চেষ্টা করেছি, ও শুধুই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বা বসে আমার কথা শুনেছে। কদাচিৎ এক আধটা প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কখনই তর্ক করবার চেষ্টা করেনি।

কেন, বলতে পারব না, কলেজে উঠাবার পর থেকে আমি কখনই মুখতারকে আমার সম্মুখে মাথা উঁচু করে কথা বলতে দেখিনি। ওকে দেখলে কেবলই মনে হয়েছে ছেলেটি অতি মাত্রায় ভদ্র নম্র এবং লাজুক প্রকৃতির। তাই, ওরই বন্ধুরা যেদিন আমাকে খবর জানাল যে মুখতার কারমাইকেল কলেজের ভি, পি, নির্বাচিত হয়েছে, সেদিন কিছুটা অবাক হয়েই আমি

তাদের জিজ্ঞেস করিছিলাম - ব্যাপারটা কি রকম হোল? ঐ লাজুক মুখচোরা ছেলেটিকে দিয়ে কিভাবে কাজ চালাবে?

উত্তরে ছেলেরা বলেছিল, আপনি ওকে ঠিক চেনেন না। মুখতার লাজুক মুখচোর একেবারেই নয়; খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারে, কবিতা লিখতে পারে আরও ভাল। খুব কাজের ছেলে। আপনার সম্মুখে মুখতার একেবারেই কথা বলতে পারে না, তা শ্রদ্ধাবশতঃ হতে পারে। কিন্তু নীতিগতভাবে ও খুব দৃঢ় - কোথাও মুখতার একেবারেই মাথা নীচু করে চলে না। আপনি ওকে ঠিক বুঝতে পারেন নি।

সম্ভবত তাই, আমি মুখতারকে ঠিক বুঝতে পারিনি। অন্ততঃ পক্ষে সেদিন যে ব্যাপারটা ঠিক ঐ রকমই ছিল তাতেও কোনই সন্দেহ নাই। তাই পরে মুখতারকে আরেকটু ভাল করে বুঝবার জন্য আমি ওর কর্মতৎপরতার বিষয় একটু বেশি খোঁজ-খবর রাখবার চেষ্টা করে আসছিলাম। আর, যতই ওর খবর রাখছিলাম, ততই যে ওর বিষয় আমার ধারণটা গুড়ের থেকে বেটারের দিকেই এগিয়ে চলেছিল, তাও অস্বীকার করতে পারব না।

পরে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ রংপুরে এবং বাংলাদেশের আরও অনেক স্থানে, যে লস্কাকান্ড শুরু করে দেয়া হয়েছিল, যে লস্কাকান্ডকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইয়াহিয়া-টিক্কার দল ২৫শে মার্চ রাত্রে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষাণা করেছিল। সেই ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত রংপুরে মুখতারের যে কর্ম তৎপরতা লক্ষ্য করেছিলাম, তাতে মুখতারের বিষয় আমার ধারণা যে বেটারকে ছাড়িয়েও আরও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল, তাও অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু তাই বলেই ঐ ধারণাটি যে অদূর ভবিষ্যতেই একেবারে বেষ্টে গিয়ে পৌঁছে যাবে, তাও তখন কিছুই কল্পনা করতে পারিনি।

তারপর ২৫শে মার্চ রাত্রে যখন ঘর ছাড়তে বাধ্য হলাম তখন প্রথমেই মনে পড়েছিল মুখতারের কথা। খবর করতে হবে যেন দেখা করে, কিংবা অন্তত ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কারফিউয়ের মধ্যে ওদের ক্যান্টনমেন্ট ঘেষা বাড়িতে কিছুতেই খবর করা সম্ভব হয়নি। ২৯শে মার্চ সকালে কারফিউ শিথিল হতে খবর পেলাম মুখতার আত্মগোপন করেছে। আরও তিন দিন রংপুর শহরের আসে পাশেই ছিলাম ছেলেদের সাথে মিলে কিছু পরামর্শ করবার জন্যই। কিন্তু একজন বাদে কাউকেই শহরে পাওয়া যায়নি, সব পালিয়েছে। তাই, কাজ বা কাজের পরামর্শ করতে না পারলেও অনেকটাই নিশ্চিন্ত মনেই রংপুর শহর ছেড়ে যেতে পেরেছিলাম। ছেলেরা প্রায় কেউই ধরা পড়েনি, পালিয়েছে, তাই কাজও নিশ্চয় হবে।

তিস্তা নদীর উত্তর পারে কাকিনাতে এসে আস্তানা করেছি। E.P.R.- এর ছেলেরাও সব বর্ডার ক্যাম্প ছেড়ে এসে মুক্তিফৌজ হয়ে ঐ খানেই জড়ো হয়েছে। তাদের সঙ্গেই জুটে গেছি। রংপুর শহর থেকেও দলে দলে সব ছেলেরা এসে ঐখানে জুটতে শুরু করেছে। খবর পেলাম, দিন তিনেক আগে মুখতার ঐ রাস্তা ধরেই ভারতে প্রবেশ করেছে। অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। দিন দুয়েকের মধ্যে শহর থেকে মুকুলও এসে পৌঁছাল, কিন্তু কিছু কাজের কথা হবার আগেই মুকুল আবারও কোথায় উধাও হয়ে গেল। পরে শুনলাম, মুখতার কয়েকটা হাতে তৈরি হাতে বোমা, মানে, বড় পটকা কচুবিহার থেকে সংগ্রহ করে এনেছে, এবং তাই নিয়েই রংপুর শহরে ঢুকবার জন্য এগিয়ে গেছে। মুখতারকে নিয়ে মুকুল ফিরেও এসেছিল এবং আবারও ভারতে ফিরে গেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সাথে আর দেখা হয়নি।

পরে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরাও যখন ভারতে গিয়ে আস্তানা করতে বাধ্য হয়েছি তখন মুখতার-মুকুলদের অনেক কার্যকলাপের বিষয় খবর শুনতে থাকলাম। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মুখতারের নাম দিয়ে এক চৌদ্দদফা নির্দ্দেশনামা প্রচার করা হয়েছে। তাতে সবাইকে মুক্তিফৌজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান হয়েছে, এবং আশে পাশেই যে মুক্তিফৌজ ট্রেনিং ক্যাম্প সব রয়েছে, তারও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে ঐ আহ্বান পত্রে। আরও খবর পেলাম মুখতার, মুকল, জব্বার সবাই খবর সংগ্রহ করবার জন্য আর সেই সঙ্গে ছেলেদেরও ডেকে আনবার জন্য রংপুর এবং নিলফামারীতে যাতায়াত করছে। দু-এক দিনের মধ্যেই মুখতারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম - লিখেছে, ছেলেরা সিতাই এসে পৌঁছালে আমি যেন তাদের মাথাভাঙ্গা পাঠাবার ব্যবস্থা করি; কিছু সত্যিকারের কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। পরে, দিন দু'একের মধ্যেই মুখতার সিতাইতেই এসে উপস্থিত হোল, আমার সঙ্গে নাকি বিশেষ পরামর্শ আছে।

সেদিন মুখতার যখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখন সিতাই হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি কাকিনার মুসলিম লীগ ছাত্র নেতা শাহ আলমের সাথে কথা বলছিলাম। শাহ আলম মুসলিম লীগার বলেই এসে বিপদে পড়েছে। এদিকে পুলিশ তাকে ইতিমধ্যেই দু'বার এ্যারেষ্ট করে বসেছে। অবশ্য ছেড়েও দিয়েছে নিশ্চয়ই। তবুও আলম যে কিছুটা ঘাবড়িয়েও গিয়েছে, তাও ঠিক। আলম ঐ সব কথাই আমাকে বলছিল। বলছিল, মুসলিম লীগার বলেই অনেকে তার বিরুদ্ধে এখানে অনেক ধরনের কথা বলে বেড়াচ্ছে, সে জন্যই তাকে এ ধরনের বিপদে পড়তে হয়েছে। অথচ আলম যে এবার প্রথম থেকেই আমাদের সাথেই রয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন করেও অনেক বিশেষ বিশেষ কাজে রপ্ত হয়েছে; কালীগঞ্জ থানা লুট করবার দিনও যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, এসব খবর অন্য অনেকে না জানলেও আমি যে জানি, সে সবই আলম আমাকে বলছিল।

ইতিমধ্যে মুখতার আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই আলম চলে গেল। মুখতারকে বললাম, তোর খবর পাচ্ছি, ছেলেদেরও পাঠাচ্ছি, নতুন খবর কি বল? তুই পটকা নিয়ে রংপুর ঢুকতে গিয়েছিলি, - ব্যাপার কি? অতটা অধৈর্য্য হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। মুকুল, জব্বার এবং অন্য ছেলেরা সবাই ভাল আছে তো? ইত্যাদি আরও অনেকগুলো প্রশ্ন সেদিন আমি ওকে করেছিলাম। কিন্তু, মুখতার এসব প্রশ্নের কোনাটার উত্তর না দিয়েই, ফিরিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, - দাদা, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি ঐ মুসলিম লীগার আলমকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলেই ও এখানে বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারছে? ওকে কি আপনি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন? বেশ কিছুটা অভিমানের সুরেই মুখতারই ঐ কথাগুলো আমাকে বলেছিল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি যখন ওকে বুঝিয়ে বললাম, কেন আমি আলমকে বিশ্বাস করি, এবং ইতিমধ্যেই আলম কি কি কাজ করেছে, তাও কিছুটা বললাম; আরও বললাম আজতো মুসলিম লীগার আওয়ামী লীগারের প্রশ্ন নয়রে। আজ প্রশ্ন হচ্ছে, কে সত্যিকারের বাঙ্গালী। কে বাংলার সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, তারই। কাজের মধ্য দিয়েই তাদের চিনে নিতে হবে। সেদিন যে ঐ কথাগুলো কোন বিশেষ ইঙ্গিত দেবার জন্যই বলেছিলাম না, তাও ঠিক। আর ঠিক, যে মুখতার শেষ পর্যন্ত ঐ কথাগুলো যে সত্য তার প্রমাণ পেয়েছিল, ওর জীবনের বিনিময়েই পরে ও যা করে বসলো, তাতে আমি শুধুই অবাক হইনি, একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, মুখতার মাত্র একটিই। সারা বাংলাদেশে মুখতারের পর্যায়ের ছেলে আর একটিও আছে কিনা তা আমি আজও বলতে পারি না। অন্ততপক্ষে আমার চক্ষে সেরকম আর দেখিনি।

ঐ কথাগুলোর উত্তরে মুখতার আমার পায়ে হাত দিয়ে জোড়া হাতে বলেছিল, - সুনীলদা আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এসব খবর কিছুই জানতাম না। আমি আলমের উপর অন্যায় করেছি, আমিও মুসলিম লীগার বলে ওর নামে একটা রিপোর্ট এখানে করেছি। সম্ভবত আমার রিপোর্টের কারণেই ওকে কাল এ্যারেষ্ট করা হয়েছিল। আমি আলমের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেব এবং আমার রিপোর্টটি যে ভুল তাও যথাস্থানে জানিয়ে দেব।

মুখতারের ঐ ব্যবহারের পরে সেদিন রাজনীতি বা যুদ্ধনীতি নিয়ে বেশি আলোচনা আর হয়নি। শুধুই ওকে বলেছিলাম, - তুমিই আমার নেতা, তুমি যা বলবে সেই ভাবেই কাজ করবো। আমাদের অস্তিত্ব রাখতে হলে লড়াই আমাদের জিততেই হবে। ঐ জেতাটুকুই মাত্র আমাদের ঠিক রাখতে হবে। মুখতার আবারও শুধুই মাথা নীচু করে আমার কথাগুলো শুনে ছিল। মুখতার আজ নাই, কিন্তু ওর সহকর্মীরা, যারা বলতে গেলে আমারই ছেলের মত, সব রয়েছে। যাদের সাথে দেখা হলেই, আমি তাদের আজ নেতাজী বলেই সম্বোধন করি। কেন

যে করি তা ছেলেরা আজও কেউই জানে না। করি, মুখতারকে স্মরণ করবার জন্যই। যে ছেলে অত সহজে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে; সে অবশ্যই আমার স্মরণীয়।

পরে, বেশ কিছুদিন মুখতার এবং তার বন্ধুদের আর দেখা পাইনি। পাবার কোন সম্ভবনাও ছিল না, কারণ ওদের সব বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিং শেষ করে ফিরে আসবার পরও মুখতারের সাথে দেখা হয়নি। তবে, ওর বন্ধুরা মাঝে মাঝেই আসত, তাদের কাছেই ওর বিষয়ও কিছু কিছু খবর পেতাম।

আরও কিছুদিন পরে, আমাদের আস্তানারাই একজন বিশিষ্ট কর্মী আফজল, যখন আস্তানাতে কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকবার পর আবার ফিরে এলো, তখন তার কাছ থেকেই আবারও মুখতারের বিষয় অনকে কিছু শুনতে পেলাম। শুনতে পেলাম মুখতার আর মুকুলের নেতৃত্বে স্পেশাল গ্রুপের দুটো দল গীতালদহ সীমান্তের ফুলবাড়ী থানা হয়ে, লালমনিরহাটকে পাস কাটিয়ে, রাজারহাট হয়ে রংপুর শহরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। বাধা পেয়ে বাধ্য হয়ে দু'তিন জায়গায় গোলাগুলি চালিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আফজল ঐ এলাকায় বেশ কিছুদিন মাষ্টারী করেছিল, ঐ এলাকার রাস্তা-ঘাটও তার অনেকটাই জানা ছিল, তাই আফজলকে গাইড ধরেই তারা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

মুখতারদের ঐ অসাফল্যে যে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম, তাও কখনই নয়, বরং কিছুটা স্বাস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিলাম। কিন্তু তবুও কিছুটা অস্বস্তিও যে বোধ করিনি তাও মোটেই নয়। অস্বস্তি বোধ করেছিলাম এই জন্যেই যে, ছেলেগুলো অতবড় একটা বিপদের মধ্যে এগিয়ে গেল, অথচ আমাকে কিছুই জানাল না। আমাকে জানাবার কোনই কারণ নিশ্চয়ই ছিল না। অর্ডার হয়েছে, শত্রু লাইনের পিছনে চলে যাবার, তাই ওরা সেই চেষ্টাই করেছিল। তবুও কিছুটা অস্বস্তি যে বোধ করছিলাম তাতেও কোনই সন্দেহ নাই। তাই ওদের খবরের জন্যও একটু বিশেষ ভাবেই ব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এলো, মুখতারের কাছ থেকেই চিঠি পেলাম। লিখেছে, সুনীলদা আমাদের ভেতরে ঢুকে যাবার অর্ডার হয়েছে। ঢুকে যাবার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু পারিনি - তাও নিশ্চয়ই শুনেছেন। আবার ঢুকবার চেষ্টা করছি এবার আপনার ওখান দিয়েই ঢুকবার চেষ্টা করব। আপনার সাহায্য অবশ্যই চাই। আপাতত, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোথাও দু'এক দিন থাকবার মত আস্তানা ঠিক করে রাখবেন, কারণ ভারতের সীমানার মধ্যে থাকবার অর্ডার নাই। আজ বেশি রাতেই গিয়ে পৌঁছাব।

কাছাকাছি বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে একটা খালি বাড়ি দেখে ঠিক করে আসা হোল এবং পরে বেশি রাতে, মুখতার দল সুদ্ধ এসে পৌঁছুলে, সেখানে নিয়ে তাদের রেখেও আসা হোল। পরের দিন সদলবলে মুকুলও এসে পৌঁছাল। মুখতার এবং মুকুল রংপুর জেলা স্পেশাল গ্রুপের দু'ভাগের দুই লিডার। পরে এই স্পেশাল গ্রুপকেই যে মুজিব বাহিনী নামকরণ করা হয়, তা আজ অনেকেই জনেন।

ওদের যে কত বিরাট বিপদজনক কাজের ভার দিয়ে পাঠান হয়েছে, তাও সবই বুঝতে পারলাম। মুক্ত এলাকায় বসে বেশি দেরী করবারও ওদের উপায় নাই। তবুও বল্লাম তোমাদের লড়াই করবার জন্যই ভেতরে যাবার অর্ডার হয়েছে, সুইসাইড করবার জন্য নয়। অস্ত্র নিয়ে তোমরাই প্রথম দলবদ্ধভাবে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছ। তাই কোন রাস্তায় যাবে কোথায় আস্তানা করবে এবং তোমাদের সাথে যোগাযোগই বা রক্ষা করা হবে কিভাবে, এসব কিছুটা ঠিক না করে ভেতরে যাবার কোন মানে হবে না। তাই ব্যস্ত হয়ো না।

ব্যাপারটা যে মুখতার বুঝতে পারেনি, তা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু ওর ভয়, পাছে কেউ মনে করে যে ছেলেরা ভেতরে যেতে ভয় পাচ্ছে, তাই দেরী করছে। তবুও কিছুটা দেরী করিয়েই ওদের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়েছিল।

তবে দেরী হয়েছিল বলেই যে ওরা বসেছিল তাও কখনই নয়। প্রথম দিন থেকেই রাস্তা-ঘাটের সন্ধান করবার কাজে লেগে গিয়েছিল। কোথায় আস্তানা করা সম্ভব হবে, গাইড হিসাবে কে কে যেতে পারবে, এই সবই তখন ঠিক করা হচ্ছিল। মুখতার নিজেই ঘুরে ফিরে বহু দিকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক করতে ব্যস্ত ছিল।

সব ব্যাপারেই মুখতার যে কত সত্যনিষ্ট এবং সাহসী ছিল তা না দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না। একদিন বিকেলে ওর আস্তানায় গিয়েছিলাম কিছু পরামর্শের জন্যই। কিন্তু ও ছিল না। সকালে বেরিয়েছে রাত দশটায়ও ফিরলো না। সাধারণত ওর আস্তানায় গেলে ছেলেরা আমাকে কিছুতেই ফিরতে দিত না। শোবার ওদের খুবই কষ্ট হতো, আমি থাকলে আরও বেশি হতো। তাহলেও কখনই আমাকে ছাড়তে চাইতে না। কিন্তু সেদিন ওদের আস্তানায় আমার পক্ষে কিছু নিষিদ্ধ খাদ্য ওরা রান্না করেছিল বলেই, আমাকে আর থাকবার জন্য অনুরোধ করলো না। বরং আমার আস্তানায় খাবার ফুরিয়ে যাবার আগেই যাতে আমি ফিরে যাই তার জন্যই ব্যস্ত ছিল, তবুও রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমি রওনা হয়ে পড়লাম।

বর্ষাকালের জল-কাদার রাস্তায় মাইল তিনেক হেঁটে আমি যখন প্রায় বর্ডারের কাছে পৌঁছেছি,

আমার আস্তানা তখন আর এক মাইলও নয়, রাস্তাও ভালই, তখন হঠাৎ দক্ষিণের এক কোণ থেকে মাঠের জল ভেঙ্গে একজন লোককে এ দিকে আসতে দেখলাম। কাছে আসতেই চিনতে পারলাম - মুখতার। বল্লে, রাস্তা-ঘাটের খোঁজ করতে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ফিরতে দেরী হোল। আমি বল্লাম, এত রাতে একলা আজ আর তোর আস্তানায় ফিরতে হবে না, চল আমার ওখানেই থাকবি। ছেলেরা সব ভালই আছে, কিছু চিন্তা করতে হবে না।

কিন্তু মুখতার কিছুতেই আমার সঙ্গে যেতে রাজী হোল না। বল্লে, ভারত বর্ডারের ভেতর আমাদের থাকবার অর্ডার নাই। শুধু তাই নয়। আমি ওকে আমার টর্চ লাইটটা দিতে চাইলেও, কিছুতেই ও সেটা নিতে রাজী হোল না। আবারও বল্লে, আমি জানি আপনি ভীষণ সাপের ভয় করেন, এবং লাইট না হলে রাতে একেবারেই চলাফেরা করতে পারেন না। কিন্তু আমি সাপের ভয় একেবারেই করি না, অন্ধকারে চলতেও আমার তাই কোন ভয় হয় না। আমার রিভলবারটা জাম হয়ে গেছে, আপনি বরং এটি নিয়ে যান কোথাও ঠিক করে নিয়ে আসবেন। বলে ওর বিকল রিভলবারটি আমাকে দিলো। আমার কাছে দুটো গ্রেনেড ছিল তারই একটা আমি ওকে দিয়ে বল্লাম, একেবারে খালি হাতে কখনই চলাফেরা করবে না। তারপর দু'জনে দু'দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

অন্য একদিন, ওর আস্তানাতেই রাতে রয়ে গেছি, কিন্তু শোবার ব্যবস্থার যা অবস্থা তাতে ঘুমোবার কোনই আশা নাই। গায়ে গায়ে লেগে সবাই শুয়ে রয়েছে, আমিও তারই মধ্যে। গরমে আর মশার উপদ্রবে মাঝ রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হলাম। বাইরে এসে দেখি, মুখতার আর কয়েক সঙ্গী উঠানে চাটাই পেতে শুয়ে রয়েছে। আর একটা ছেলে একটা এস, এল, আর, নিয়ে সেন্ট্রি ডিউটি করছে। ছেলেটির কাছ থেকে অস্ত্রটি চেয়ে নিয়ে আমি তাকে বল্লাম, আমার ঘুমানো অসম্ভব, তুই ঘুমোগে যা। সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না তাই কিছুটা গালাগালি করেই ওকে পাঠিয়ে দিতে হোল। কিন্তু মুখতারেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুখতার এস আমাক এখানে থাকতে অনুরোধ করে যে আমাকে কষ্ট দেয়া হয় ইত্যাদি নানা ধরনের কথা বলতে লাগলো, এবং বাকি রাতটা বাইরে বসে আমার সাথে গল্প করেই কাটিয়ে দিল। অন্য আর এক দিন, আমি যখন ঘুমোতে না পেরে বাইরে আসলাম তখন মুখতারও জেগেই ছিল। সেন্ট্রি ছেলেটিকে ডেকে বোললে, রাইফেল আমাদের এখানে রেখে তুই ঘুমোগে যা। দাদাও ঘুমোবে না আমারও ঘুম হবে না, - আমরাই পাহারা দেব।

তারপর ক্রমেই মুখতারদের আস্তানা এগিয়ে যেতে থাকলো দক্ষিণের দিকে শত্রু লাইনের কাছে থেকে আরও কাছে। E.P.R.'এর রেল লাইনটাই ছিল তখন শত্রু এবং মুক্ত

এলাকার সীমারেখা। শেষ পর্যন্ত ঐ লাইনের ধারেই এক আস্তানায় ওরা কয়েকদিন ছিল। মাঝে মাঝে ঐসব আস্তানাতেই আমাকে যেতে হয়েছে।

যখন ওদের ভেতরে ঢুকবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়েছে। তখন একদিন ওদের সাথে শেষ পরামর্শ করবার জন্য আমি এবং আস্তানার কর্মী বন্ধু নওজেস রওনা হয়ে গেলাম। সাইকেলে করে রওনা হয়েছিলাম, তাই রাস্তায় জল কাদা বাঁচিয়ে যাবার জন্য গিয়েছিলাম অনেকটা ঘোরা পথেই। কিন্তু তবুও, বেশ কয়েক মাইল আগেই সাইকেল জমা রেখেই যেতে হয়েছিল। পথে চলতে চলতেই শুনতে পেলাম ওদের আস্তানার দিকেই কোথাও লড়াই চলছে। রাইফেল, মেশিনগান আর মর্টারের আওয়াজ ক্রমেই আরও জোরদার হয়ে উঠতে থাকলো। পরে ওদের আস্তানা থেকে মাইলখানেক আগে এক মুক্তি ফৌজ কোম্পানী হেডকোর্য়াটারে যখন উপস্থিত হলাম, তখন লড়াইয়ের স্থান প্রায় আরকি দৃষ্টি সীমার মধ্যেই। শুনলাম, রেল লাইনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ৫০/৬০ জন পাক ফৌজ নেমে এসেছিল লুটপাট করে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেবার জন্য। খান ছয়েক বাড়ি তারা পুড়িয়েও দিয়েছে, কিন্তু মুক্তি যোদ্ধারাও তাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। লড়াই চলছে দু'ঘন্টা আগে থেকে এবং সম্ভবত সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবেও।

ঐ হেড কোয়ার্টার আস্তানায় মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা কেউ নেই, সব লড়াইতে এগিয়ে গেছে। গ্রামের কয়েকজন লোক আস্তানা পাহারায় রয়েছে এবং প্রয়োজন মত গুলি বারুদ পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই, আর এগোন হোল না, ঐ খানেই বসতে হোল। যুদ্ধ ব্যাস্ত কমান্ডার তাজির উদ্দিনকে জিজ্ঞেস করে পাঠানো হোল আমাদেরও কিছু করবার আছে কি না? উত্তর এলো একেবারে শেষ বেলায়। তাজির বলে পাঠিয়েছে, স্পেশাল গ্রুপের ছেলেরা যারা কাছেই রয়েছে, তাদের যদি সাহায্যের জন্য পাঠাতে পারি, তাহলে খুবই ভাল হয়। সন্ধ্যে হলেই পাকিস্তানীরা পালাবার চেষ্টা করবে, তখন ওদের আরও ভালভাবে ঘেরাও করে শেষ করবার চেষ্টা করা যাবে। স্পেশাল গ্রুপের ছেলেদের যে ঐ জায়গায় লড়াই করবার অর্ডার নাই, তা তাজিরও জানত, আমিও জানতাম। তাই, তাজির নিজেই ওদের অনুরোধ না করে আমাকে বলে পাঠিয়েছিল। এ অবস্থায় ওদের সাহায্য করতে না যাবার কোন মানে হবে না মনে করেই, আমিও মুখতারকে ব্যাপারটা লিখে পাঠালাম। আধ ঘন্টাও দেরী হয়নি, মুখতার দশজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আমরাও ওদের সাথেই চললাম। খানিকটা এগিয়েই একটা মরা নদী নৌকায় পার হতে হয়। নৌকায় উঠেই মুখতার আমাকে বল্লে, - দাদা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে; অনেক দূর আপনাদের ফিরতে হবে, তাই আর আসবেন না। আমরা লড়াই জিতবই। মুখতারের সাথে সেই আমার শেষ দেখা। মুখতার লড়াই ঠিকই জিতেছে।

ওদের যাবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ, দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে। তাই পরের দিনই আবার ওদের সাথে দেখা করতে আসব ঠিক করলাম। কিন্তু তা হয়নি। তার পরের দিন আবারও রওনা হলাম, দুপুর রোদে হেঁটেই। কিন্তু যখন প্রায় তিন ভাগ রাস্তা পার হয়েছি। তখন একটা ছেলের সাথে দেখা হোল, সে জানালে, - মুখতাররা আগের রাতেই রেল লাইন পার হয়ে কাউনিয়ার কাছে তিস্তা জংসনের দিকে চলে গেছে। ইতিপূর্বেও আরও একবার ওরা রেল লাইন পার হয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু যেতে পারেনি, আবারও ফিরে এসেছিল। এবার আর ফেরেনি।

আজ মুখতারের স্মৃতিচারণ করতে বসে, কত কথাই না নতুন করে মনে পড়ছে। শুধু মনে পড়ছে না, ওর চরিত্রে কোন খুত দেখেছি বলে। আর যে দুর্জ্জয় সাহস এবং সহিষ্ণুতা দেখেছি তার কোনই তুলনা নাই। মুখতারের চেহারাটা দেখলে ওকে যেরকম শান্ত শিষ্ট ভদ্র এবং নম্র প্রকৃতির মনে হোত, তারই সাথে ওর সাহসী, কষ্ট সহিষ্ণু এবং সংগ্রামী চরিত্রের প্রায় কিছুই মিল ছিল না। মনে হয়, ঐ টুকুই ছিল ওর খুত, যার জন্য ওকে ঠিকভাবে বুঝতে পারাও কঠিন হোত।

মুখতার সদলবলে ভেতরে ঢুকে যাবার দিন সাতেক পরেই ওদের প্রথম খবর এলো। লিখেছে   সব ভাল, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। প্রথম অপারেশনে বিশেষ ভাবেই সফল হয়েছে। আপনার জন্য একটা ষ্টেনগান সংগ্রহ করেছি, সেই সঙ্গে একটা সটগানও। সেটাই মুখতারর শেষ চিঠি। যদিও নিশ্চিত হবার কোনই উপায় ছিল না, তবুও খবর যে আসতে শুরু করেছে, মানে, আমাদের যোগাযোগ রক্ষিত হয়েছে, তাই কিছুটা আস্বস্তও হয়েছিলাম।

পরে বিশেষ কাজে কয়েক দিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন যখন 'বাংলার বাণী' অফিসে মুখতারের বড় ভাই মুশতাকের সাথে কথা বলছিলাম, সেই সময়ই রংপুর জেলা ছাত্র লীগ সভাপতি রফিকুল খবর নিয়ে এলো, - ভেতরে তিস্তা নদী পার হয়ে রংপুর শহরের দিকে এগোবার রাস্তায়, এক বাড়ীতে আস্তানা করে থাকবার সময় মুখতাররা পাক হানাদারদের হাতে ঘেরাও হয়ে পড়েছিল। কোন রকমে পালিয়ে গেছে, কিন্তু ওদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরের দিনই ফিরে এলাম। এসে যা শুনলাম তা ঠিক আগের মত নয়। ওরা ঠিক ঘেরাও হয়েছিল না। আমাদেরই আর এক কর্মী বন্ধু সাংবাদিক মজিদের বাড়িতে মুখতারের দল একদিন আশ্রয় নিয়ে চলে যাবার পরেই পাক ফৌজ মজিদের বাড়ি ঘেরাও করে মজিদকে ধরে নিয়ে গেছে। তাই, খবরটা আস্বস্ত হবার মতও যে নয়, তাও বলাই বাহুল্য।

মুজিব বাহিনীর অন্যান্য দলগুলোও ক্রমে সব ভেতরে চলে যেতে থাকলো। মাঝে মাঝে তাদের কার্য্যকলাপের কিছু কিছু খবরও আমাদের কাছে আসতে থাকলো। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার ভাল কিছু উন্নতি যে আমরা নভেম্বর প্রথমে পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি, তাও ঠিক। ইতিমধ্যে মুক্তি বাহিনীরও কিছু কিছু ছেলেকে ভেতরে পাঠান শুরু হয়ে গেছে। আর মুখতারের মুজিব বাহিনীর ছেলেরা তো ভেতরে সব লন্ডভন্ড কান্ড শুরু করে দিয়েছে। বহু জায়গায় রাস্তা এবং রেলপুল উড়িয়ে দিয়েছে, রাজাকার আর দালালদের পাইকারী হারে হত্যার ব্যবস্থা করে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। এমনকি কয়েক জায়গায় পাক ফৌজের সাথে সামনাসামনি লড়াইতেও অবতীর্ণ হয়েছে মুজিব বাহিনীর ছেলেরা।

এইসব খবর আসতে আসতেই নভেম্বরের ৯/১০ তারিখে গুজবের খবর এলো, মুখতার ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েছিল কিন্তু কোন রকমে পালিয়েছে। খবরটা খুব পরিষ্কার নয়, তাই আমাকে আবারও উদ্বিগ্ন হতে হলো। কিন্তু পরের দিন খবর যা এলো তা আর ঠিক গুজব নয়। আমাদের রংপুরেরই একটি ছেলে এসে যা খবর জানাল, তা মোটামুটি হচ্ছে ঃ বিশেষ কারণে মুখতারকে এদিকে আসবার দরকার হয়েছিল, তাই, দল রেখে সে একলাই এদিকে আসবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোজা রাস্তায় যে প্রথম চেষ্টা সে করেছিল, তাতে তিস্তা নদী পার হবার সময় সে প্রায় ঘেরাও হয়ে পড়েও কোন রকমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পরে রংপুর শহরের কাছেই ফিরে যায়, এবং ঐ সংবাদদাতা ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে আবারও কুড়িগ্রামের পথে সীমানা পার হবার চেষ্টা করে। ঐ পথেই তারা যেদিন বড়বাড়ি গ্রামে উপস্থিত হয়, সেদিন রাতেই পাক ফৌজ ওদের আশ্রয়স্থল ঘেরাও করে। কিন্তু অন্ধকারের সুযোগে ওরা দু'জনেই ঐ আস্তানা ছেড়ে বেরিয়েও এসেছিল। তারপর ঐ ছেলেটি নদী সাঁতরিয়ে এপারে চলেও এসেছে। কিন্তু মুখতার কোন দিকে গেছে তা ছেলেটি বলতে পারে না। খবর শুনে বিশেষ ভাবেই উদ্বিগ্ন হলাম। কিন্তু কি যে করতে পারি তাও কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরের দিন রাতেই আবার খবর এলো, মুখতারকে পাক ফৌজ ধরে গুলি করে মেরেছে। সেই সঙ্গে মেরেছে ঐ ইউনিয়নের মুসলিম লীগার চেয়ারম্যানকেও, মুখতারকে আশ্রয় দেবার জন্য সন্দেহ করেই।

মুখতারের মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, পরদিন সকালে ছাত্রনেতা অলোক আর রফিকুলকে পাঠালাম, এগিয়ে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্যই, আর মুখতারের সহযোগী মুকুলকে খবর পাঠালাম, - সাবধান আরও সাবধান। আর নিজেও রওনা হয়ে গেলাম মুক্তিফৌজ হেড কোয়ার্টারে, অনেক জরুরী কাজের সঙ্গে মুখতারের কোন খবর সেখানে এসেছে কি না তাও জানবার জন্যই।

বিকেলে ফেরবার পথে অলোক আর রফিকুলের সাথে দেখা হোল দিনহাটা বাস ষ্ট্যান্ডে। ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, খবর সত্যি। বেশি যেটুকু ওরা বল্লে, তা হচ্ছে যে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ সেক্রেটারীই মুখতারকে ধরিয়ে দিয়েছে। পরে খবরটা যে সত্যি তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে লোক এখনও পলাতক। মুসলিম লীগার চেয়ারম্যান মুখতারকে আশ্রয় দিল, আর আওয়ামী লীগার ধরিয়ে দিল। অদ্ভূত হলেও সত্যি ঘটনা। মুখতারের জীবনের বিনিময়েই এই সত্যটুকু আমরা লাভ করেছি। তাই, দালাল খুঁজতে শুধু বিশেষ দিকে তাকালেই চলবে না।

সেদিন ঐ বাস ষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অলোক আর রফিকুলকে আমি কোন কথাই বলতে পারিনি। পরে বাসে করে আসবার সময় মনে মনে কেবলই বলছিলাম, - মুখতার মৃত্যুবরণ করেছে, মুখতার তোমাদের মধ্যে দীর্ঘজীবি হয়ে উঠুক। স্বাধীন বাংলাদেশে যেন বহু বহু মুখতারের সাক্ষাৎ পাই। তবেই বাংলার স্বাধীনতা সত্য হবে। সফল হয়ে উঠবে মুখতারের এবং আরও লক্ষ শহীদের জীবন দান।

সুনীল কুমার গুহ কর্তৃক রচিত যুগানুশীলন সাহিত্য সংঘ, রংপুর থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'শহীদ মুক্তার এলাহি' শীর্ষক পুস্তিকা হতে সংকলিত। সুনীল কুমার গুহ একজন শিক্ষক এবং সাংবাদিক। (নিবন্ধে কিছু তারিখ বিভ্রাট সংশোধন করা হয়েছে)।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কে. মুখতার ইলাহী

সালমান বিন হাফিজ

আমার চিনু চাচা (শহীদ খোন্দকার মুখতার ইলাহী) যুদ্ধে যাবার সময় দাদীকে বলেছিলেন "মা আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি, আবার দেশ মাতাকেও বড় ভালবাসি"। আর চাচার শহীদ হবার সংবাদে আমার দাদী বলেছিলেন, "আমি তো দেশের জন্য চিনু'কে কোরবানী দিয়েছি"। এমন মহান শহীদ ও শহীদ জননীর জন্য আমি ও আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া চাইছি।

২১ বছরের এক টগবগে তরুণ চিনু, ১৯৭০-৭১ সালের সেই উত্তাল দিনগুলিতে কারমাইকেল কলেজ এবং রংপুর শহরে মুক্তিকামী ছাত্রজনতার অকুতোভয় নেতা। উত্তর বঙ্গের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সেই সময়ের নির্বাচিত ভিপি। হ্যাঁ, বলছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ - খোন্দকার মুখতার ইলাহী ওরফে চিনু'র কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সেই দিনগুলিতে রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

শহীদ মুখতার ইলাহী ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোন্দকার দাদ ইলাহী, মাতা মরিয়ম খানম। আদি নিবাস মাগুরা জেলায় হলেও খোন্দকার দাদ ইলাহী সরকারী চাকুরী সূত্রে রংপুরে বসতি স্থাপন করেন। রংপুর শহরের ধাপ এলাকায় তাঁদের বাসা। দাদ ইলাহী উত্তর বাংলার জেলাগুলোতে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখেন। রেঞ্জ স্কুল পরিদর্শক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও পরে তিনি কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাহীগঞ্জ আফানউল্যাহ উচ্চ বিদ্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। দাদ ইলাহী'র সাত পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে মুখতার ইলাহী ছিলেন চতুর্থ পুত্র।

কারমাইকেল কলেজ থেকে আইএ পাশ করে মুখতার ইলাহী একই কলেজে ইংরেজি বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ছিলেন অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। শহীদ মুখতার ইলাহী ছাত্র লীগের রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। অত্যন্ত স্বভাব

কবি ও সুবক্তা হিসেবে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাঁর ছিল ব্যাপক জনপ্রিয়তা। শুধু কারমাইকেল কলেজ নয় তিনি ছিলেন সারা শহরের ছাত্র সমাজের প্রিয় নেতা। ছাত্র লীগের প্রার্থী হিসেবেই কারমাইকেল কলেজের ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। বড় ভাই খোন্দকার মুশতাক ইলাহীও ১৯৬৬-৬৭ সালে কারমাইকেল কলেজের ভিপি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মুশতাক ইলাহী ১৯৭০-৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ভিপি এবং ডাকসু'র সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

একাত্তরের তেসরা মার্চ রংপুরের মানুষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিলো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে। মিছিলে মিছিলে মুখরিত রংপুরের রাজপথে সেদিন জাতির স্বাধীনতার জন্য প্রথম জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শহীদ কিশোর শহীদ শংকু সমঝদার। রংপুর শহরে সেদিন আবুল কালাম আজাদ ও ওমর আলী নামে আরও দুইজন শহীদ হন। শুরু হয় রংপুর অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকেই মুখতার ইলাহী রংপুরের এক বন্দুকের দোকান থেকে প্রাথমিক অস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন ধাপ ও হাজীপাড়া এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৮ মার্চ সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে তীর-ধনুক, বাঁশের লাঠি, দা, কুড়াল নিয়ে রংপুরের বীর জনতা ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে। অপরদিকে ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণের রাস্তা বরাবর ১৪-১৫টি জিপে বসানো মেশিন গান দিয়ে অবিরাম গুলিবর্ষণ করে পাক বাহিনী। অসম সেই লড়াইয়ে সেদিন পাক বাহিনীর ছোঁড়া মেশিনগানের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়ে ছিলেন আনুমানিক প্রায় দুই হাজার লোক। হায়েনার দল নিহত ও আহতদের একত্রিত করে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এই ঘটনার পরপরই মুখতার ইলাহী উপলব্ধি করেন, এখন সময় সম্মুখ সমরের। তাই তিনি প্রশিক্ষণের জন্য তাঁর বাহিনীসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে চলে যান। সেই সময় কুচবিহারের সাহেবগঞ্জ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। বিএলএফ (মুজিববাহিনী)-এর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এখানে। সাহেবগঞ্জে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সাংগঠনিক প্রতিভা ও দক্ষতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রংপুর শহরে সংঘবদ্ধ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের। ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন হাজীপাড়া এলাকা ছিল তাঁর অন্যতম কর্মক্ষেত্র। হাজীপাড়া ও আশেপাশের গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন একটি ঝটিকা গেরিলা বাহিনী।

স্থানীয় যুবক মতিন, মাহাবুবার, মান্নান প্রমুখের সহায়তায় হাজীপাড়ায় স্থাপন করেন একটি স্থায়ী গেরিলা ঘাঁটি। গেরিলা সদস্যদের দুইটি দলকে তিনি কুচবিহারের সাহেবগঞ্জে নিয়ে যান প্রশিক্ষণের জন্য। তাঁরা প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে রংপুর শহরে বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করেন সাফল্যের সাথে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মডার্ন সিনেমা হলকে (বর্তমান টাউন হল) পাক হানাদার বাহিনী বানিয়ে ছিল "গণ নির্যাতন কেন্দ্র"। বৃহত্তর রংপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনা হতো নিরপরাধ মুক্তিকামী বাঙ্গালী মানুষজনকে। যাদের একটি বড় অংশ ছিল কম বয়সী নারী। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ধরে আনা সেই সব নারীদের উপরে দিনের পর দিন চলতো পাশবিক নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস এই টাউন হলে চলেছে মানুষরূপী হায়েনাদের নজির বিহীন গণধর্ষণ, গণনির্যাতন আর গণহত্যা। মুখতার ইলাহী আগস্ট মাসের দিকে এই গণনির্যাতন কেন্দ্রে হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তৈরী করেন একটি বিশেষ গেরিলা গ্রুপ। সাহেবগঞ্জ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অস্ত্রাগার ইনচার্জও তাঁর বড় ভাই মঞ্জুর ইলাহীর সাথে আলোচনা করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এরই অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে অস্ত্রসজ্জিত একটি অগ্রবর্তীদলকে মুখতার ইলাহী রংপুরে প্রেরণ করেন। অপর একটি ক্ষুদ্র দলসহ অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে ১৯৭১ সালের ০৮ নভেম্বও তিনি সাহেবগঞ্জ থেকে লালমনিরহাট হয়ে রংপুরের দিকে রওনা হন। রাত হয়ে যাবার কারণে লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ির কাছে আইর খামার নামক এলাকায় যাত্রা বিরতি করতে হয় এই ক্ষুদ্র দলটিকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাক হানাদার বাহিনীকে তাঁদের এই অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয় জনৈক দালাল।

১৯৭১ সালের ০৯ নভেম্বর রংপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। এদিন ভোরের দিকে দালাল মারফৎ খবর পেয়ে বিপুল সংখ্যক (প্রায় ৪০০) সৈন্য নিয়ে পাক হানাদার বাহিনী আইর খামার গ্রামটি ঘিরে ফেলে। মুখতার ইলাহী'র নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সাহসিকতার সাথে হানাদারদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু সংখ্যায় কম থাকার কারণে অসম সেই লড়াইয়ে তাঁদের পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়নি। মুখতার ইলাহী অজ্ঞাত পরিচয় এক বালক মুক্তিযোদ্ধাসহ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের সহ মোট ১১৯ জন মুক্তিকামী জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। পরে গ্রামবাসী আইর খামার ডাকবাংলো (এখন প্রাইমারী স্কুল) প্রাঙ্গণে এই ২ জনকে সমাহিত করেন। এই নির্মম

হত্যাকান্ডের মাত্র এক মাসের মাথায় খোন্দকার মুখতার ইলাহী'র "মুজিব বাহিনী" ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দখলমুক্ত করেন রংপুর শহর। মুখতার ইলাহীসহ লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় মাতৃভূমি। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে অবস্থান করে নেয় বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পরে রংপুর পৌরসভার উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মুখতার ইলাহী স্মরণে রংপুর শহরের প্রধান সড়কের নামকরণ করে "শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী"। পরে প্রধান সড়কের জেলা প্রশাসকের বাস ভবন থেকে রাজা রামমোহন রায় মার্কেট পর্যন্ত অংশের নামকরণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের অপর বীর শহীদ ইয়াকুব মাহফুজ আলী (জররেজ ভাই) স্মরণে "শহীদ জররেজ সরণী" এবং রামমোহন মার্কেট থেকে শাপলা চত্বর পর্যন্ত অংশের নাম থেকে যায় "শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী"।

কিন্তু এটা অত্যন্ত লজ্জা ও হতাশাজনক যে, এতো দিনেও আমরা এই নাম বলতে অভ্যস্ত হইনি। আমরা আজও ষ্টেশন রোড বলে থাকি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডেও লেখা হয় ষ্টেশন রোড। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে পাইয়ে দিয়েছেন একটি লাল সবুজের পতাকা, ৫৫ হাজার বর্গমাইল ভূমির মালিকানা, একটা স্বাধীনদেশ; তাঁর নামে নামকরণকৃত সড়কের নাম বলতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হইনি। এর থেকে লজ্জার আর কি হতে পারে?? তাই আসুন, এই মুহূর্ত থেকে নিজেরা এই শহীদের স্মরণে নামকরণকৃত সড়কের অফিসিয়াল নাম বলতে অভ্যস্ত হই, অন্যদের উৎসাহিত করি। পাশাপাশি রংপুরের গণমানুষের দাবী অনুযায়ী, এই বীর শহীদের আত্মত্যাগের স্মৃতি ধরে রাখতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

কৃতজ্ঞতা: বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুজিব বাহিনীর রংপুর জেলার অধিনায়ক প্রয়াত মুকুল মোস্তাফিজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত রফিকুল ইসলাম গোলাপ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ্ এমদাদুল হক।

FB: ১১ নভেম্বর ২০১৫ থেকে সংগৃহিত। নিবন্ধের স্থান বিশেষে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করা হয়েছে।

শহীদ মুখতার ইলাহী

তোফাজ্জল হোসেন

আসলে মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ঠ পৃথিবীতে কিছু মানব আসে প্রতিটি জাতিকে কিছু উপহার দিতে নিজের জীবনকে জাতির জন্য উৎসর্গ করে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকে। যেমন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যোতিন, মাষ্টার দা সূর্য্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তীতুমীর, ফকির মজনু শাহ, নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু, নুরুল দ্বীন এই বাংলার স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। অনুরূপ খোন্দকার মুখতার ইলাহী এসেছিলেন এ বাঙালি জাতিকে কিছু দিতে যা তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আমাদেরকে ঋণী করে গেছেন।

আজ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪২ বছর। তার কথা হারিয়ে গেছে। কেউ মনে রেখেছে বলে মনে হয়না। যে যুবকটি আকারে লিকলিকে ফর্সা চেহারা ছিলেন। সাধারণত: হাফ হাতা শার্ট ও ফুল প্যান্ট পরতে ভালবাসতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ ইং বছরে সরকারী কারমাইকেল কলেজ রংপুর-এর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র লীগ থেকে ম্যাগাজিন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কারমাইকেল কলেজে ইংরেজি বিষয়ের পড়ালেখা করতেন। ছাত্র লীগের মাহবুবুল বারী ও জায়েদুল হক প্যানেল থেকে নির্বাচন করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে রাজনীতি শুরু করি এবং তাদের হাতেই রাজনীতির খড়ি। পরবর্তীতে ১৯৭০-১৯৭১ ইং বছরের কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি পদে খোন্দকার মুখতার ইলাহী এবং আকবর আলী ও রশীদুজ্জামান যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মুখতার ইলাহী ছাত্র লীগ প্যানেল থেকে নির্বাচন করে তৎকালীন বার-তেরশ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে থেকে ভিপি নির্বাচিত হন। এই লিকলিকে যুবকটি ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হবেন তা বোধগম্যই ছিল না। ঐ বার ছাত্র লীগের একই প্যানেল থেকে আমিও ছাত্র কমনরুমের সহকারী সম্পাদক পদে ছাত্র লীগ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। সংসদে ছাত্র লীগ প্যানেল বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। আমি প্রায় ৫০০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হই। আমার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জনাব গাবুর স্যাকলাইন বর্তমানে সৈয়দপুর এমপি সাহেবের ছোট ভাই। সে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলো। সেও প্রায় আড়াই শত ভোট পান। ছাত্র কমনরুম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। আমার সহপাঠী আলতাফ হোসেন (জলঢাকা কৈমারী) তার বাবা অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে আলতাফ তেমন অবদান রাখতে ব্যর্থ হন। ১৯৭০-১৯৭১ সালের কলেজ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন,

সূর্য এবং হাবিবি আজমদের পল্লী ছাত্র সংসদ, ইসলামী ছাত্র সংঘ, নির্বাচনে অংশ নেয়। ইসলামী ছাত্র সংঘ চরমভাবে ব্যর্থ হয়। কোন পদেই নির্বাচন উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মুখতার ইলাহী'র বিশিষ্ট সহচর ছিলেন সৈয়দ জিয়াউল হক শিবু। ১৯৭০-৭১-এ ঐ প্যানেল থেকে তিনি ম্যাগাজিন সম্পাদক নির্বাচিত হন। সহকারী ম্যাগাজিন সম্পাদক হন সহপাঠী জনাব আবুল মালেক (আমেরিকা প্রবাসী), বর্তমান আওয়ামী লীগ রংপুর জেলা শাখার সভাপতি আবুল মনসুরের ছোট ভাই। সে মহান মুক্তিযুদ্ধে কোচবিহার থেকে প্রকাশিত সোনার বাংলা পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত ছিল। মালেক ১৯৭২-৭৩ বছর সংসদে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। সে নির্বাচনে জনাব খালেকুজ্জামান ভিপি নির্বাচিন হন। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মোজাফ্‌ফর) থেকে নির্বাচন করেন। যাক ১৯৭০-১৯৭১-এর সংসদের সাধারণ সম্পাদক আকবর আলী (বাবু খাঁ)-এর জীবন-যাপন ছিল সাদা সিদে। সদা হাস্যময় (স্বাধীনতা উত্তর তিনি কামরাইকেল কলেজে "উত্তরবঙ্গ ছাত্র পরিষদ" নামে একটি ছাত্র সংগঠন করেছিলেন)। ১৯৭০-৭১-এর নির্বাচিত ছাত্র সংসদের অনেকেই আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করি। যেমন, খোন্দকার মুখতার ইলাহী, আকবর আলী, রশিদুজ্জামান (বর্তমানে একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ), পান্না সহপাঠি, আবু তৈয়ব সরদার, তোফাজ্জল হোসেন, জসিজুল হক, সরকার ইসহাক আলী সহ অন্যান্য। আর কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের সহিত সরাসরি দু-এক বার দেখা হয়েছিল, যেমন সেক্টর কমান্ডার সিরাজুল আলম খান দাদা, জনাব তোফায়েল আহম্মেদ, প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাক, প্রয়াত শেখ ফজলুল হক মনি, মার্শাল মনি, বর্তমান মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ভাই, প্রয়াত আব্দুল মান্নান (চট্টগ্রাম) বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হাফিজ এবং জনাব শুভ্রাংশু চক্রবর্তী প্রমুখ।

যাক, লেখাটি উৎসর্গ করার কথা ছিল শহীদ মুখতার ইলাহী'র জন্য। মুখতার ইলাহী দেরাদুনে ট্রেনিং নিয়ে রংপুর শহরে ঢুকে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং ফুলবাড়ি বড়বাড়ি হয়ে রংপুর শহরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। সে সময় ভারতের কোচবিহার, দিনহাটা হয়ে ফুলবাড়ি থানা দিয়ে রাজার হাট, কুলাঘাট, লালমনিরহাট, কাউনিয়া, রংপুর শহরে এবং কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাড়া পশ্চিম অঞ্চলে ঢুকতে হলে খরস্রোতা ধরলা নদী পাড়ি দিতে হতো। এমন কি তিস্তা নদীও। নদীগুলোর তখন যৌবন কাল ছিল। কুলাঘাট, কাউয়াহাগাঘাট, কলাখাওয়াঘাট দিয়ে গুনটানা নৌকা দিয়ে নদী পাড়ি দিতে হতো। মুখতার ইলাহী এমন সময় নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর, আলসামস, দখলদারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রংপুর ঢুকতে চেয়েছিলেন। তিনি ফুলবাড়ি কুলাঘাট দিয়ে লালমনিরহাট অঞ্চলের বড়বাড়ি হাট এলাকায় আবুল কাশেম চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাথে আরও দু-একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বড়বাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম একজন মুসলিম লীগের হলেও তিনি

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানতে পেরে লালমনিরহাটে অবস্থানরত স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও পাকসেনারা চেয়ারম্যানের বাড়িসহ গ্রামটি ঘিরে ফেলে। মুখতার ইলাহী সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ও চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দিনটি ছিল ০৯ই নভেম্বর ১৯৭১ ইং। উল্লেখিত লোকজন ছাড়াও তারা গ্রামবাসী বহু বাঙালীকে হত্যা করে। শহীদ আবুল কাশেম চেয়ারম্যানের সুযোগ্য সন্তান সাবেক মন্ত্রী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু তার বাবার নামে বড়বাড়ি হাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যার স্মৃতি অম্লান। মুখতার ইলাহীর শহীদ হওয়ার খবরটি পেয়ে যাই সহযোদ্ধা আবু তৈয়ব সরদার-এর মাধ্যমে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। শহীদ মুখতার ইলাহী সহ আরও একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আইর খামার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সন্নিকটে কবর দেওয়া হয়।

এই মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর একবার মৃত্যুর কোল থেকে ফিরেছিলেন। দিন ক্ষন মনে নেই। তবে ৮ই মার্চ থেকে ২১শে মার্চ হবে। রংপুরসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। প্রশাসন কর্তক ঘনঘন ঘন্টায় ঘন্টায় কারফিউ। কারফিউ প্রত্যাহার চলছে। এই সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কিছু সাথীর সাথে রংপুর কলেজের সেন্ট্রাল রোডের পার্শ্বে পুরাতন ছাত্রাবাসের ভিতর হাত বোমা বানাতে যেয়ে বোমার Splinter ফসকে গিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে যখম হয়। তার মুখ মন্ডলে প্রাপ্ত ক্ষতগুলো ২২শে মার্চ দেখেছিলাম। এই সময়ের ভিতর ছাত্র জনতার বিভিন্ন জঙ্গী মিছিলে স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। বোমা বানানোর কারণে তার নামে প্রশাসন হুলিয়া জারি করে। এই হুলিয়ার জন্য মিছিলের স্লোগান ছিল 'মুখতারের হুলিয়া নিতে হবে তুলিয়া'। ২৩শে মার্চ সকাল ৮-৩০ মিনিট রংপুর ডেপুটি কমিশনার অফিসের প্রশাসনিক ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলক হিসেবে তিনি ছিলেন। ২৪শে মার্চ ১৯৭১ আবার রংপুর কলেজের সেন্ট্রাল রোডের পুরাতন হোস্টেলে সেই ঐতিহাসিক গোপন সভা যে সভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব মনিরুল হক চৌধুরী বলেছিলেন ২-৩ দিন পর এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবে এবং এদেশ ভিয়েতনামের মত গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবে; তার সাথে প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী বলেছিলেন স্বাধীনতার পর উত্তর বঙ্গকে প্রদেশ করা হবে। তবে জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আজ হউক কাল হউক উত্তরবঙ্গকে একটি প্রদেশ করতেই হবে। যার রাজধানী হবে রংপুর। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পাকহানাদারদের অপারেশণ সার্চলাইট শুরু হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতমুখি হয়ে যাই। নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত সবাইকে দুটি করে ঠিকানা দেয়ার জন্য বলেন। সভায় উপস্থিত সকলে দুটি করে ঠিকানা প্রদান করলাম। যাহাতে একে অপরের সহিত যোগাযোগের সুবিধা হয়।

স্বপন চৌধুরী ১২ই আগস্ট ১৯৭০ সালে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাবক ছিলেন এবং পরবর্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বপন চৌধুরী এই উত্তর বঙ্গকে পৃথক প্রদেশ করার প্রস্তাব করেছিলেন রংপুরের সেই ছাত্রসভায়। তিনি সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও হাসানুল হক ইনুদের সহযোগি হিসেবে কাজ করতেন। যুদ্ধের শেষ লগ্নে তিনি পাকহানাদারদের হাতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধরা পড়েন। ধরা পড়ার সময় তিনি শত্রুদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন। আহত অবস্থায় পাক বাহিনী বিভিন্ন খবর নেওয়ার জন্য তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাঙ্গামাটি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ১৬ই ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি মুক্ত হয়। মুজিব বাহিনী রাঙ্গামাটি দখলের জন্য কৃতিত্ব সহকারে যুদ্ধ করে। ১৬ই ডিসেম্বর স্বপন চৌধুরী রাঙ্গামাটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দু-একদিন পরে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার সেবাদানকারী নার্সকেও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

শহীদ মুখতার ইলাহী'র পিতা দাদ ইলাহী তার আত্মত্যাগকারী সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পান তার প্রাক্তন ছাত্র আবুল মনসুরের নিকট হতে। মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর। মুখতার ইলাহীর জেষ্ঠ্য ভাই মনজুর ইলাহী নৌ-বাহিনী থেকে পালিয়ে এসে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৬ নম্বর সেক্টরে যোগদান করে। ৬ নম্বর সাব-সেক্টর থেকে তিনি আর্মস এবং এ্যামুনেশন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। তার আর এক ভাই জনাব মুশতাক ইলাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র লীগের নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাত্র লীগ নেতা ও মুজিব বাহিনীর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মনি কর্তৃক ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তার পরিবারের আত্মীয়স্বজন ১৯৯৪ ইং সালে শহীদ মুখতার ইলাহী'র স্মৃতি রক্ষার্থে 'শহীদ মুখতার ইলাহী ট্রাষ্ট' গঠন করে। আজ আমিও নিজেই একজন সন্তানের জনক। তিন জন সন্তানের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর দিকে তাকিয়ে এই বাবা দাদ ইলাহী কতই না আহাজারি করেছিলেন। একমাত্র ভুক্তভোগী পিতারাই বলতে পারবেন। কেননা যুদ্ধে যাওয়ার ফলে আমার বাবা সহযোদ্ধা জসিজুলের বাবাসহ নজিম খা বন্দরে প্রতি সপ্তাহে দু-একবার একত্রিত হয়ে বসতেন এবং উভয় পিতা চোখের পানি ফেলতেন এবং অন্তরের আবেগ প্রকাশ করতেন।

মুখতার ইলাহীর সম্পর্কে লিখতে গেলে আজ ৪২ বছর পর মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। পহেলা ফেব্রুয়ারি রাত ১১.০০টা কনকনে শীতের রাত লালবাগ রেল ক্রসিং এর দক্ষিণ-পশ্চিমে জয়বাংলা হোটেল (বর্তমান বিলুপ্ত)-এ অলক সরকার (ছাত্র লীগের অন্যতম সংগঠক), মাহবুবুল বারী, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, সৈয়দ জিয়াউল হক শিবু, মুখতার ইলাহী এবং আমি রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। কনকনে শীতের রাত পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারি

To Camp Comd

Copy to : A Sector

6 Sector

HQ 6-C Sub Sector
Mukhti Bahini Rangpur
Field
100/2/ /Q
Nov, 71

Sub Ammuntion Expenditure /Demand

Our letter No 100/X/, 100/XI/ & 100/XII/ dated 16-11-71 refer

N/65966 NK KM Elahi of Sub Sector 6-C (Shahebgonj area) has been authorised to draw the ammunition as mentioned in our specimen signature under reference.

2. His specimen signatures are given below

a. [signature]
b. [signature]
. [signature]

[signature]
Comd
No 6 Sector

অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত মঞ্জুর ইলাহী'কে প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র

১৯৭১ তারিখে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দিন ধার্য্য ছিল। ব্যানার, ফেস্টুনসহ অনেক কিছু বানাতে হবে। কারমাইকেল কলেজে সর্ব দক্ষিণে দোতলা বিল্ডিংটি ছিল যাকে থার্ড বিল্ডিং বলতাম। ঐ বিল্ডিং এর নীচ তলায় ছিল কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের অফিস। রাত্রে ঐ অফিসে মুখতার ইলাহী, জিয়াউল হক শিবু ও আরও কয়েকজনসহ নিজেও কাজে লেগে গেলাম। জিয়াউল হক শিবুর সাথে মুখতার ইলাহীর হৃদ্যতা বেশি ছিল হেতু মুখতার ইলাহী শিবুকে বললেন, 'এই শিবু এবারের ছাত্র সংসদ নির্বাচন তো শেষ'। আগামী বছর যখন নির্বাচন হবে তখন ছাত্র লীগের একজন কর্মী হিসেবে প্রয়োজনে বিছানাপত্র নিয়ে এসে সংগঠনের জন্য শ্রম দিব। তার এই আকাংখা আর পূর্ণ হয়নি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আমরা বাবা-মায়ের কোলে ফিরলেও মুখতার ইলাহী আর ফেরেনি। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আমাদেরকে ঋণী করে গেছেন।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন রংপুর মহকুমার মুজিব বাহিনীর লিডার হিসাবে তিনি দায়িত্বভার নিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার শহীদানের পর মুকুল মোস্তাফিজ রংপুর মহকুমার মুজিব বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ডেপুটি লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এ্যাডভোকেট হায়দার আলী (পীরগঞ্জ, রংপুর)। মুখতার ইলাহী রাজনৈতিক কার্যক্রমে দেশে যেমন ছিলেন হিরো, ভারতেও ছিলেন হিরো। কিন্তু তার চেয়ে বড় নেতারা দেশে ছিলেন হিরো, ভারতে ছিলেন জিরো।

মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল হোসেন রচিত 'জাফলং থেকে হাফলং' (রংপুরঃ বর্ণসজ্জা, ২০১৪) পুস্তকের অধ্যায় ৩১ থেকে পুণঃমুদ্রিত।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী

রংপুর জেলা সমিতি (ঢাকা)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধে রক্তদান করে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদের মর্যাদা অর্জন করেছেন তাঁদের অন্যতম মুখতার ইলাহী। তিনি ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ রংপুর শহরের ধাপে এক শিক্ষাবিদ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম চিনু। তাঁর পিতার নাম খোন্দকার দাদ ইলাহী ও মাতার নাম মরিয়ম খানম। তাঁর পিতা শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত থেকে তিনি রেঞ্জ স্কুল পরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

খোন্দকার দাদ ইলাহী'র সাত ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে মুখতার ইলাহী'র স্থান চতুর্থ। মুখতার ইলাহী কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন এবং এর পর ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন। তিনি রাজনীতিতে জড়িত হয়ে ছাত্র লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। একজন জনপ্রিয় ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি কারমাইকেল কলেজ সংসদের (১৯৭০-৭১) সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সাল। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি ঔদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করেন। ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস হামলা প্রতিরোধকল্পে অগণিত মানুষের সাথে মুখতার ইলাহীও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। রংপুর শহরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের সূচনালগ্নে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সূত্রপাতে ছাত্র লীগের এক কর্মীবাহিনী নিয়ে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাঁর কর্মীবাহিনীসহ সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলার কুচবিহারে গমন করেন। সে সময় কুচবিহারের সাহেবগঞ্জ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ঘাঁটি। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ছিল। সাহেবগঞ্জে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি "মুজিব বাহিনী" নামক গেরিলা বাহিনীর রংপুর শাখার কমান্ড প্রধান নিযুক্ত হন। সংগঠনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতা গুণে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রংপুর শহরে মুক্তি সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করেন। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন হাজীপাড়া ছিল তাঁর অন্যতম কর্মকেন্দ্র। তিনি হাজীপাড়া ও আশেপাশে গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে একটি ঝটিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। স্থানীয় যুবক মতিন, মাহবুবার, মান্নান প্রমুখের সহায়তায় তিনি হাজীপাড়ায় একটি স্থায়ী গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করেন। গেরিলা সদস্যদের দুইটি দলকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য তিনি সাহেবগঞ্জ নিয়ে যান।

এঁরা ফিরে এসে রংপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাফল্যের সাথে বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করেন।

সে সময় রংপুর শহরের টাউন হল ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একটি নির্যাতন কেন্দ্র। হায়েনারূপী পাকিস্তানী বর্বর সৈনিকদের পাশববৃত্তি চরিতার্থের জন্য টাউন হলে নানা বয়সী মহিলাদের বন্দী করে রাখা হতো। নারকীয় অত্যাচার নির্যাতনে তারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের মৃতদেহ বাইরে পুঁতে ফেলা হতো। ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে মুখতার ইলাহী নির্যাতন কেন্দ্র টাউন হল আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এজন্যে তিনি একটি বিশেষ গেরিলা গ্রুপও গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি। পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ৮ নভেম্বরে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসজ্জিত একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মুখতার ইলাহী কুচবিহারের সাহেবগঞ্জ থেকে লালমনিরহাট হয়ে রংপুরের পথে রওনা দেন। লালমনিরহাটের বড়বাড়ির নিকটবর্তী আইর খামার গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য তাঁরা যাত্রা বিরতি করেন। সেসময় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তিস্তা রেলসেতু রক্ষার জন্য সেখানে পাক হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাটি স্থাপিত হয়েছিল। হানাদার বাহিনীর দোসর আইর খামার গ্রামের জনৈক দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের খবর হানাদার বাহিনীর কাছে গোপনে সরবরাহ করে।

১৯৭১ সালর ৯ নভেম্বর এক শোকাবহ দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেরও এক স্মরণীয় দিন। ৯ নভেম্বর ভোরে প্রায় ৪০০ হানাদার সৈন্য আইর খামার গ্রামটি ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অসম সাহসিকতার সাথে হানাদার বাহিনীর মোকাবেলা করেন কিন্তু সে সংগ্রামে জয়লাভ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। একজন অজ্ঞাত পরিচয় যোদ্ধাসহ মুখতার হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। মুখতার ইলাহী সহ কয়েকজন সহযোদ্ধা সংঘাতের সুত্রপাতে শহীদ হন। আইর খামার গ্রামের মুক্তিসংগ্রামী আরও ৫৪ জনকে হানাদার বাহিনী বন্দী করে। * এভাবে হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ মুখতার ইলাহী ও অজ্ঞাত পরিচয় মুক্তিযোদ্ধার লাশ পরবর্তীকালে গ্রামবাসীরা আইর খামার ডাকবাংলা (বর্তমানে প্রাথমিক স্কুল) প্রাঙ্গণে দাফন করেন। এর একমাস পর মুখতার ইলাহী'র মুজিববাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দল রংপুর শহর হানাদার কবল মুক্ত করেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী'র স্মৃতি স্মরণার্থে রংপুরের প্রধান সড়কটির নামকরণ করা হয় 'শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী'। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাজনিত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সড়কটির নামকরণ বদলে দেওয়া হয়।

---

* সর্বমোট ১১৯ জনের গণহত্যার ঘটনা এই স্থানে ঘটে (কে.ম.ই)।

শহীদ মুখতার ইলাহী চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে দেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে শুধু মুখতার ইলাহী নয় সকল মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন ও আকাঙ্খার সফল বাস্তবায়ন ঘটবে।

---

১৫ জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত রংপুর জেলা সমিতি ঢাকা'র দ্বিতীয় সাধারণ সভা, ১৯৯৩ উপলক্ষ্যে 'গুণীজন সংবর্ধণা' স্মরণীকা থেকে পুনঃমুদ্রিত।

একটি দেশের যুদ্ধ - একটি পরিবারের যুদ্ধ

কাজী আহসান

[বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী পরিবারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। এরূপ একটি পরিবার শহীদ খোন্দকার মুখতাব ইলাহী'র। এই পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক পরোক্ষভাবে- যখন তাঁর মেজো ভাই খোন্দকার মউদুদ ইলাহী উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান কোরছিলেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট (স্টুডেন্ট্স উইং) 'এর মাধ্যমে। তখন এই সংস্থা বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাজ করছিল। পরে আমি এবং মউদুদ লন্ডনস্থ বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ এ্যাকশন কমিটির সাথে স্বদেশ মুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ি। মউদুদের সাথে ঘনিষ্টতার ফলে তাঁর দেশ, জনগণ ও পরিবার সম্পর্কে সব কিছুই আমার জানা হয়ে যায় - আমি যেন তাঁদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাই। এই ইলাহী পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ততা আমি খুব কাছ থেকে অনুসরণ করতে থাকি। মউদুদ দেশে ফিরে মুখতার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য জানান। এই যোগাযোগের ফসল এই লেখা। রচিত হয়েছে ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সময়কালের সংগৃহীত মূল ঘটনাবলী ভিত্তি করে। ঘটনার সূত্রপাত হোক মুখতারের কথা থেকে।]

মুখতার'এর কথা

খোন্দকার মুখতার ইলাহী, ডাক নাম চিনু - রংপুরের এক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পরিবারে ২৬ মার্চ, ১৯৪৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা - খোন্দকার দাদ ইলাহী (মৃ. ১৯৭৯) আদি পিতৃভূমি মাগুরা (বৃহত্তম জেলা যশোহরের আন্তর্গত) থেকে চাকুরী সূত্রে ১৯৫৪ সালে রংপুর শহরে বসত স্থাপন করেন। বৃটিশ শাসনামলে এবং স্বাধীনতা পূর্বকালে উত্তর বঙ্গীয় জেলা সমূহের শিক্ষা বিস্তারে অবদানের জন্য তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। চাকুরী হতে অবসরকালে তিনি কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাহিগঞ্জস্থ আফানুল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুখতার ১৯৭০-১৯৭১ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং একজন ছাত্র লীগ কর্মী ছিলেন। উল্লেখ্য তাঁর অগ্রজ, খোন্দকার মুশতাক ইলাহী, এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি ও ডাকসু সদস্য এবং ছাত্র লীগ কর্মী ছিলেন। তার সর্ব জেষ্ঠ্য ভাই, খোন্দকার মঞ্জুর ইলাহী (মৃ. ১৯৯২), পাকিস্তান নৌবাহিনী পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মার্চ, ১৯৭১'এর প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন মুখতার রংপুর শহরে ছাত্র লীগের এক কর্মী বাহিনী গড়ে তুলেন। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ এবং রংপুর শহরস্থ একটি বন্দুকের দোকান থেকে প্রাথমিক অস্ত্র সংগৃহিত হয়। এই সময়

এই কর্মীদের সহায়তায় রংপুর শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠে।

সম্ভবতঃ ৩ মার্চ তারিখে কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংসদের আহ্বানে মুখতার ইলাহী'র নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল আলম নগর ষ্টেশন রোডে বিহারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই মিছিলে রংপুরে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা বহণ করছিল ছাত্র লীগ কর্মী শরিফুল আলম। বিহারীদের গুলিতে শরিফুল আলম এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি চিকিৎসা অবস্থায় মারা যায়। এরপর থেকে খন্ডিত আকারে পুরো শহরে বিহারী-বাঙ্গালী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এই সময় রংপুরস্থ আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিহারীরা বাঙ্গালী বিরোধী নানান সহায়তা লাভ করতে থাকে। এই সমস্ত ঘটনাবলী শহর ও সন্নিহিত এলাকায় প্রতিরোধ বাহিনী তৈরিতে জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকে। এই সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ কর্মীদের জন্য দুঃসময় ছিল, কেননা, বিহারী চরেরা রাতের আঁধারে এই সমস্ত কর্মীদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর পাক আর্মি ও বিহারীদের এই ধরনের কর্মকান্ড হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখতার ও তাঁর কর্মী বাহিনী গ্রামে গ্রামে এক ব্যাপক প্রতিরোধ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন। এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও, বিশেষ করে, জনাব তৈয়বুর রহমান এবং জনাব সিদ্দিক হোসেন সক্রিয় সহায়তা প্রদান করেন। ৮ মার্চ তারিখে দামোদরপুর গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যের একটি দল এরূপ একটি প্রতিরোধের মুখে পড়ে। জানা গেছে যে, তারা কিছু বিহারী গাইডের সহায়তায় এই গ্রামের কয়েকজন স্বাধীনতাকামী কর্মীদের গ্রেফতারের জন্য গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা এদের ঘেরাও করে প্রথমে নিরস্ত্র করে এবং পরে প্রহরান্তে গ্রামের বাইরে আর্মি ক্যান্টমেন্টের নিকট ফেলে যায়। এই একটি ঘটনা এরপর থেকে পুরো রংপুর শহরকে যুদ্ধাবস্থায় ফেলে দেয় এবং সামরিক বাহিনী ও ছাত্র-জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ প্রায় প্রতিদিনই ঘটতে থাকে।

২০ মার্চের পর থেকে রংপুর শহরের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। মুখতারের নেতৃত্বে ছাত্র কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে থাকে, যা সমগ্র সংগ্রামী জনতার মধ্যে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। ২৫ মার্চ বিকালে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে হঠাৎ করে একটি হ্যালিকপ্টারের স্বল্পকালীন আগমন ছাত্র-জনতার মধ্যে চাপা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে শহরে রটে যায় যে, বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া-ভূট্টো বৈঠক ভেঙ্গে গেছে, আর রাতে সমগ্র দেশে ব্যাপক ধর-পাকড় হতে পারে। এর মধ্যেই রংপুর শহরে রটে যায় যে, ক্যান্টনমেন্টে বাঙ্গালী অফিসারদের পাক সেনারা নিরস্ত্র করেছে এবং বাঙ্গালী সৈনিকদের আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। আরও জানা যায় যে, বেশ কিছু প্রতিপত্তিশালী বিহারী ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে

আশ্রয়লাভ করেছে এবং যেহেতু শহর সম্পর্কে এদের ধারণা ভাল, সেহেতু তাদেরকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি চালানোয় ব্যবহার করা হচ্ছে। এরাই গত ১০-১৫ দিন নৈশ অভিযানে আর্মির গাইড হিসেবে কাজ করেছে।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় যখন পাক সেনারা ধ্বংস যজ্ঞ শুরু করে বাঙ্গালী সত্তা উৎখাতের কাজে নেমে পড়ে, তখন রংপুর শহরে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়। এর সাথে কিছু কিছু স্থানে অবাঙ্গালীরা লুঠতরাজ শুরু করে। এসময় মুখতার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মীরা শহর ত্যাগ করে নিকটবর্তী গ্রামে অবস্থান নেন। ২৬ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগ নেতাগণ রংপুর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। মার্চ মাসের শেষে আরও সংগঠিত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মুখতার তাঁর কর্মী বাহিনীসহ দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

স্মর্তব্য যে, এই সময় রংপুর শহরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের প্রতিরোধ কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ঢাকার ঘটনাবলী এদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই ধরনের এক প্রতিরোধ সূচীর আওতায় ক্যান্টনমেন্ট ও নিকটবর্তী নিশবেতগঞ্জ এলাকার কয়েক হাজার গ্রামবাসী এবং আদিবাসী ২৮ মার্চ বিকালে অতি সাধারণ অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে বসে। মুক্তি পাগল জনতা পাকিস্তানীদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ভয়ও বিন্দুমাত্র করে নাই। যাই হোক, পাক সেনারা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণের রাস্তা বরাবর ১০-১৫ টি জীপে বসানো মেশিনগানের সাহায্য গুলিবর্ষণ শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ১০০০ দুঃসাহসী গ্রামবাসী হতাহত হয়। এর কিছু পরই পাক বাহিনী মৃত ও আহতদের ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন খালের ধারে একত্রিত করে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এর আগে বহু আহতদের বেয়োনেট খুঁচিয়ে বা বন্দুকের বাটের আঘাতে স্তব্ধ করা হয়েছিল। আরও জানা যায় যে, এই অভিযানের নেতৃত্বে একজন বাঙ্গালী দালাল অফিসারও নিযুক্ত ছিল।

এই ঘটনা মুখতার ও তার কর্মীরা পরদিন জানতে পারেন - বুঝতে পারেন যে, সক্রিয় প্রতিরোধ এবং সর্বাত্মক বিদ্রোহর সময় এখন - এখন যদ্ধের সময়। মার্চের শেষে মুখতার সদলে সর্বপ্রথম ভারতে কুচবিহারের সাহেবগঞ্জ পৌছান। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্থায়ী ক্যাম্প তৈরির কাজ শুরু হয়। দুই মাসের মধ্যে এখানে 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পরিপূর্ণ গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। মুখতার 'মুজিব বাহিনী' গেরিলাদের জেলা প্রধান নিযুক্ত হন।

একটি পরিবারের যুদ্ধ

মুখতারের বাড়ির অবস্থান ছিল রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পূর্বদিকে - মাঝে একটি কাঁচা রাস্তা আর একটি পুরাতন গ্রাম - বাদিয়াপাড়া। উত্তরে জেলখানা। পুরো ৭১ সাল জেলখানা ও ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তাবাহিনী সদস্যদের আশীর্বাদপুষ্ট অবাঙ্গালী ও দালালদের উৎপাতের লক্ষ্য ছিল এই বসতবাড়ি। বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও ছোট তিনভাই প্রকারান্তরে ছিল এদের হাতে বন্দী। গৃহপালিত গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী এবং বাড়ি সংলগ্ন সুবিশাল বাগানের ফলমূল এদের উদরপূর্তিতে শেষ হয়ে গিয়োছিলো এই সময়। ২০.৫.৭১ তারিখে মউদুদকে লেখা পিতার পত্রে নিরাপত্তাহীনতা, সন্তানদের সাথে বিছিন্নতার দুঃখ কিছুটা ধরা পড়ে। ৬.৬.৭১ এর পত্রে তিনি মউদুদকে লিখলেন - '*শহর প্রায় জন্য শূন্য, রেলগাড়ী বন্ধ...........টাউনে ও মফস্বলে সর্বদা দুরাত্মাদের রাজ্য*'। এই চিঠিতে বুঝা যায় মুক্তিবাহিনী ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হয়ে এসেছে। তিনি জুনের পর থেকে নিরাপত্তার কারণে বেনামে তাঁকে চিঠি লিখতেন। প্রতিবারে প্রেরকের নাম পরিবর্তন করতেন। মানুষের আতঙ্ক কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এমন অবস্থা হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। তার উপর পাক সেনা অফিসারদের হুমকি ছিল মৃত্যু ও গ্রেফতারের, কেননা, মউদুদের বিদেশে অবস্থানের কারণ, কখন ফিরবে? মঞ্জুর ইলাহী নৌবাহিনী ত্যাগ করে এখন কোথায়? মুশতাক ইলাহী কোথায়? এবং সর্বপরি, মুখতার কোথায়? এ সমস্ত খবরের জন্য পিতার উপর প্রচন্ড চাপ ছিল। সন্তানদের অবস্থান ও খোঁজ-খবরের জন্য সবসময় রাজাকার বাহিনী বাড়ি সংলগ্ন ফলবাগানে বিচরণ করতো। যুদ্ধের শেষের দিকে এই বাগানেই পাক-বাহিনী ট্রেঞ্চ কেটে পুরো বাগানটি ধ্বংস করে দেয়।

রংপুর শহরের অবস্থা আরও জানা গেল মউদুদের খালাতো ভাই এবং মুশতাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু খায়রুলের ৪.৫.৭১'এর চিঠিতে '*১৮-৩০ বছরের লোকজনদের ধর পাকড় করে পাক সেনা রক্ত নিয়ে নিচ্ছে - অনেক এর ফলে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে*'। ২৪.৫.৭১'এর চিঠিতে জানা গেল, '*এরা শহরের বহু হত্যাকান্ড চালিয়েছে। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ৫ জন শিক্ষককে দমদমা নামক স্থানে এক পুলের উপর নিয়ে যেয়ে হত্যা করেছে - তাঁদের প্রায় সকলেই হিন্দু। বাদিয়াপাড়া গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা*'। ১৬.১০.৭১ তারিখে পিতার পত্রে মউদুদ জানতে পারলেন যে, '*রংপুর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার জনাব মকসুদ আলী আত্মহত্যা করেছেন। কিছু দিন আগে পাক সেনা ও রাজাকাররা তাঁর সদ্য বিদেশ ফেরৎ পুত্র ও অন্যান্য পুত্রদের হত্যা করে*'।

যাই হোক, একটু পেছনে ফেরা যাক, মুখতারের বড় ভাই মঞ্জুর ইলাহী ফ্রান্স থেকে পাক নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ প্রশিক্ষণান্তে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এক মাসের ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন।

মউদুদের নিকট পিতার পত্র (৬-৬-৭১)

২০ মার্চ ঢাকাস্থ নৌসদর দপ্তরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। ছুটি বাতিল করে ঢাকা থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম নৌঘাটিতে পাঠানো হয়, কিন্তু চট্টগ্রাম পৌঁছানো মাত্র তাঁকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়। এই সময় অন্যান্য বাঙ্গালী নৌসদস্যদের নিরস্ত্র করে তাঁকেসহ ঘাটি সংলগ্ন একটি অতিথিশালায় বন্দী করা হয়। তিনি এই ঘাটিতে নৌবাহিনীর একটি জাহাজ থেকে অস্ত্র-গোলা-বারূদ খালাসে রাজী না হওয়া বাঙ্গালী শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। মঞ্জুর ইলাহী এরপর থেকে বন্দীদশা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে করাচীতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ তেজগাঁও বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। মধ্য রাত্রিতে বিমান বন্দর থেকে তিনি আলৌকিকভাবে পালাতে সক্ষম হন। প্রথমে মতিঝিলে তাঁর বড় বোনের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁর এক ভাগ্না, আহমেদুজ্জামানসহ নরসিংদীর এক গ্রামে আত্মগোপন করে স্বাধীনতাকামীদের সাথে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তা বিলম্বিত হলে তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের স্থানীয় শাখার দারোয়ান হিসেবে একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে পাবনার শাহজাদপুরে একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দলের কিছু সদস্যসহ তিনি আগষ্ট মাসে গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট হয়ে কুচবিহারের সাহেবগঞ্জ পৌঁছান। এখানে তাঁর অপর দুই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হয়। কুচবিহারের দিনহাটা থেকে মুখতার ইতিমধ্যে একটি গেরিলা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

মঞ্জুর ইলাহী সাহেবগঞ্জ বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সমরাস্ত্র ভান্ডারের দ্বায়িত্বে নিযুক্ত হন। মুখতার এখান থেকেই অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারূদ সংগ্রহ করে রংপুরের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশান চালান এবং রংপুর শহরের হাজিপাড়ায় একটি গোপন ঘাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। মুখতারের সাহসী কার্যক্রমের খবর মউদুদ সর্বপ্রথম পান খায়রুলের লেখা ৪.৫.৭১ এবং ২৪.৫.৭১ তারিখে চিঠি থেকে। পরে মুশতাকের ৯.৯.৭১ 'এর চিঠিতে আরও খবর পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে মুশতাকের ৫-১০-৭১'এর চিঠির সূত্রে মউদুদ মুক্তিবাহিনীর বেশ কিছু সদস্য এবং পাকিস্তানে আটকাপড়া বাঙ্গালীদের সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আত্মীয়-স্বজনদের যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

মুশতাক ঢাকা থেকে মার্চের শেষ সপ্তাহে গাইবান্ধা পৌঁছান। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের সাথে সাথে স্থানীয় ছাত্র লীগ কর্মীদের সংগঠিত করে সাহেবগঞ্জে মুখতারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। পুরো বর্ষাকাল তিনি এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে রংপুর, গাইবান্ধা ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে পাক সেনা ও দোসর অবাঙ্গালী এবং রাজাকারদের উৎপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাক সেনা কমান্ডের প্ররোচনায় অবাঙ্গালীরা রংপুরের নামকরণ করে 'নিউ বিহার'। রাস্তার মাইল ফলকগুলোকে এই নামে কলংকিত

করা হয়। এদের উৎপাত এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মুশতাক গাইবান্ধা ত্যাগ করে ৩১ আগষ্ট কুচবিহার পৌছান। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেখ ফজলুল হক মণির সাথে সহকারী সম্পাদক হিসেবে 'বাংলার বাণী' পত্রিকা প্রকাশের কাজে যোগদান করেন। পত্রিকাটি এই সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচারণায় পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করে। এই কাজে মুশতাককে কুচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়মিত ভ্রমণ করতে হতো। এই সময় তাঁর দেশ ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে আবেগ, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি মউদুদকে লেখা চিঠিসমূহে ধরা পড়ে। ২৯-১১-৭১- এ লেখা এ ধরনের চিঠি থেকে মুখতারের গেরিলা কার্যক্রমের কিছুটা জানা যায়। মুখতার এই সময় মহীপুর এবং রংপুর শহর প্রান্তে হাজীপাড়ায় দু'টি ঘাঁটি স্থাপন করেন। দেশ মুক্তির পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত এই দুই ঘাটি থেকে মুক্তিবাহিনীরা পাক-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

মুখতার এবং রংপুরের মুক্তি অভিযান

১৯৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে মুখতার রংপুরের অভ্যন্তরস্থ গেরিলা সদস্যদের সংঘবদ্ধ করেন এবং বিশেষ করে শহরের উপকণ্ঠে হাজীপাড়ার যুবকদের সংগঠিত করে একটি ঝটিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। রংপুর ক্যান্টনমেন্টের নিকটে হাজীপাড়ার মতিন, মাহবুবার এবং মান্নানের সাহায্যে একটি স্থায়ী গেরিলা ঘাটিও স্থাপন করেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসকের সহায়তায় এই এলাকার একটি মসজিদের মাধ্যমে গেরিলাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত হয়। একই সাথে স্থানীয় সদস্যদের দুইটি দলকে তিনি প্রশিক্ষণের জন্য সাহেবগঞ্জ নিয়ে যান। এরা পরবর্তী সময়ে রংপুর শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সফলতার সাথে বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে দিনের আলোকে পাক সেনা ও রাজাকার বাহিনী রংপুর শহরের বাইরে যেতে সহসা সাহস পেত না।

এই সময়ে রংপুর শহর কেন্দ্রে তৎকালীন মর্ডাণ সিনেমা হল হানাদার বাহিনীর একটি প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ছিল। এখানে পাক বাহিনী বহু নারী-পুরুষকে বন্দী করে রেখেছিল, যাদের অনেকে নির্যাতন ও পাশবিকতার শীকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মুখতার ১৯৭১'এর আগষ্ট মাস থেকে এই নির্যাতন কেন্দ্র আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন - এজন্য একটি বিশেষ গেরিলা গ্রুপ তৈরি করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি সাহেবগঞ্জের অস্ত্রাগার ইন-চার্জ ও তাঁর জৈষ্ঠ ভ্রাতা মঞ্জুর ইলাহীর সাথে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আক্রমণ পরিকল্পনাা চুড়ান্ত করেন। মুখতার ইতিমধ্যে, অস্ত্র-শস্ত্রসহ একটি অগ্রবর্তী দলকে রংপুর প্রেরণ করেন। অপর একটি ক্ষুদ্র দলসহ বিভিন্ন রসদ নিয়ে তিনি ৮ নভেম্বর, ১৯৭১ সাহেবগঞ্জ থেকে লালমনিরহাট হয়ে রংপুরের পথে রওনা দেন।

Mukhtar Elahi Road
Rangpur
14/1/72

মউদুদের নিকট পিতার পত্র (১৪-১-৭২)

লালমনিরহাটের বড়বাড়ির আইড়খামার গ্রামে তাঁরা রাত্রিযাপনের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রামের পাক বাহিনীর দোসর জনৈক দালাল হানাদার বাহিনীকে এঁদের অবস্থানের খবর দেয়। ৯ নভেম্বর ভোরে প্রায় ৪০০ পাক হানাদার সৈন্য গ্রামটি ঘিরে ফেলে। এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর মুখতারসহ একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক যোদ্ধা পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এই সময় ১১৯ জন নিরপরাধ মুক্তিকামী গ্রামবাসীকে পাক বাহিনী আইর খামার ডাক বাঙ্গালো প্রাঙ্গণে জড় করে। মুখতার এবং বালক যোদ্ধাটিসহ ১১৯ জন গ্রামবাসীকে পাকবাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। মুখতার এবং বালকটির লাশ পরে গ্রামবাসীরাই আইড়খামার ডাকবাঙ্গলো (বর্তমান প্রাইমারী স্কুল) প্রাঙ্গণে দাফন করেন। মুখতারের পিতার একজন প্রাক্তন ছাত্র, মনসুর, মুখতারের শাহাদৎ বরণের খবর তাঁর বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

এই সময় পাক বাহিনী রংপুর শহরে মডার্ণ সিনেমার নির্যাতন কেন্দ্র আক্রমণের পরিপকল্পনা হস্তগত করে, ফলে এই মিশন অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু ঠিক এক মাস পরই মুখতারের মুজিব বাহিনী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদল রংপুর শহর মুক্ত করেন।

বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পরপরই মুখতারের অবদান ও স্মৃতির স্মারক হিসেবে রংপুর শহরের মূল সড়কটির নামকরণ হয় 'শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী'। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সাথে সড়কটির নামকরণও পাল্টিয়ে যায়।

শেষ কথা ঃ একটি পরিবারের যুদ্ধ

বৃটেনে মউদুদ তাঁর প্রিয় ভাই মুখতারের শহীদ হওয়ার খবর পান নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। কিন্তু তাঁর পিতাকে পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য, এই খবর অনেক পরে দেওয়া হয়। এ সংক্রান্ত মউদুদের নিকট পিতার ১৪.১.৭২ তারিখের পত্রটি মর্মস্পর্শী ঃ

'............. সেই গত রমজান মাসের শেষ ভাগে সে একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে এসে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে তার মা'কে বলে গিয়োছিল যে সে ঈদের দিনে আসবে। তার সঙ্গে তার সঙ্গী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও হয়তো আসতে পারে। সে আসিল না। আমি বাড়ির পশ্চিম দিকে আলুর ক্ষেতে সারাদিন বসে তার আগমন এবং দর্শন পাবার আশায় রমজান ঈদ ও তারপর একমাস পর্যন্ত বসে কাটিয়েছি। তারপর নানারূপ ভাল সংবাদ ও মৃত্যু সংবাদ contradictory খবর শুনে ঠিক বুঝতে পারি নি যে সে আমাদিগকে ছেড়ে চিরতরে চলে গিয়েছিল ৪০ দিন আগে। অর্থাৎ ঠিক সংবাদ পেলাম মৃত্যুর ৪০ দিন পরে।'

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাক্ষরিত শোক প্রকাশসহ একটি সম্মাননাপত্র জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শহীদ মুখতার ইলাহী'র পিতা-মাতার নিকট তিনি প্রেরণ করেন। সাথে ১০০০ টাকা অনুদানের একটি চেক। শহীদ মুখতারের পিতা পত্রটি গ্রহণ করেন কিন্তু চেকটি নয়। তিনি বললেনঃ 'আমার প্রিয় সন্তানের জীবনের মূল্য ১০০০ টাকা নয় এর কোন মূল্য হয়না'। আর তাঁর মাতা বললেনঃ 'বঙ্গবন্ধুকে জানাবেন আমরা আমাদের সন্তানকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি'।

কাজী আহসান বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ব্যবসারত। তিনি ১৯৭১ স্বাধীনতা আন্দোলন কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন যার ফলে তাঁর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে এবং পরবর্তিতে তিনি পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হন।

১৯৭১ : অদম্য শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মুখতার ইলাহী

মাহবুবুর রহমান

৭১-এর ১২ নভেম্বর, ৬ নং সেক্টরের নাগেশ্বরী-ভূরুঙ্গামারী এলাকার সাহেবগঞ্জের কালমাটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে বিকাল বেলা অন্যান্য দিনের মত ব্রিগেডিয়ার জসি সাহেব এলেন মুক্তিযোদ্ধাদের চিরচেনা ছোট্ট লাল হেলিকপ্টারে করে। সেখানে ব্রিফিং দিলেন রাত ১২-১ মিঃ রায়গঞ্জে আক্রমণ হবে, পাক সেনারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য আমার দলকে যথা সময়ে রাস্তা ভেঙ্গে দিয়ে অবরোধ করতে হবে। সেই মোতবেক প্রস্তুতি নিয়ে বেরুলাম। লেঃ সামাদ (শহীদ সামাদ ঐ একই জায়গায় ২০ নভেম্বর শহীদ হন) একই সাথে তার দল নিয়ে আক্রমণে চলে যান। আমরা গেলাম রায়গঞ্জের দক্ষিণে সন্তোষপুর নামক স্থানে পাকা রাস্তা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে দেখা গেল এক্সপ্লোসিভ আরো লাগবে। একজনকে সাইকেল নিয়ে পাঠানো হলো। সে নিয়ে এলো সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট। বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির লিখেছে - তোর দেখা করতে এসেছিলাম শুনলাম অপারেশনে গিয়েছিস, শুনেছিস কিনা জানিনা, 'মুখতার ইলাহী মারা গেছে----- ।' আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম।

আমি জীবনে অসংখ্য লাশ দেখেছি অনেক রক্ত দেখেছি কখনো বিচলিত বোধ করিনি। কিন্তু এই চিরকুট যেন আমার চেতনাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছিল। আমার সাথীরা সেটা বুঝতে পেরেছিলো। জুলাইতে রংপুরে যাবার প্রাক্কালে দেখা হয়েছিলো মুখতার ইলাহী'র সাথে বলেছিল রংপুর গেলে যদি সম্ভব হয় বাবা-মা কোথায় আছে পারলে একটু খবর নিও। আচ্ছা বলে বিদায় নিয়েছিলাম আমরা রংপুর এসে তৈয়্যবুর রহমান মন্টুসহ PDB তে Xplosive চার্জ করে ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেই, যা সেই সময় BBC থেকে প্রচার হয়েছিল। নিজের বাবা-মার খবর নেওয়ার পর গেলাম মুখতার ইলাহী'র জঙ্গলে আচ্ছাদিত বাসায়, পরিচয় দিয়ে ঢুকলাম, মাকে বললাম চিন্তা করবেন না মুখতার ইলাহী ভালো আছে। মা আমাকে বললো: চিন্তা কেন করবো ওকে তো স্বাধীনতার জন্য কোরবান দিয়ে দিয়েছি। আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চিন্তা করতে লাগলাম, ছেলের খবর শোনার জন্যে মায়েরা উদগ্রীব থাকে। মা আবার বলতে লাগলো, জানো বাবা মুখতার যাবার সময় আমায় কি বলে গেছে? আমার হাত দুটো ধরে বলে গেছে, 'মা আমি তোমায় বড় ভালোবাসি কিন্তু মা আমি দেশমাতাকেও যে বড়ভালোবাসি মা'। তাই আমি ওকে দেশের জন্য কোরবাণ দিয়েছি।

চিরকুট পড়ে মনে পড়ছিলো মায়ের সেই কোরবান দেওয়ার কথা। মায়ের সেই কথা আল্লাহ্ কবুল করেছেন।

রংপুর থেকে ফিরে গিয়ে মুখতার ইলাহী'র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বলেছিলাম রংপুর কেন্টনমেন্টের পশ্চিম দিকের সব বালুর খালগুলি হাজার হাজার লাশে ভর্তি। শুনে মুখতার বলেছিল তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে আমরা শীঘ্রই স্বাধীন হচ্ছি। কারণ যারা নীরিহ মানুষকে মারে তারা যোদ্ধা নয়, তাদের যুদ্ধের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, তারা শীঘ্রি পরাজিত হবে। মুখতার ইলাহী স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। ৯ নভেম্বর লালমনিরহাট বড়বাড়ির আইর খামার নামক স্থানে এক সম্মুখ যুদ্ধে কয়েকজন সাথী যোদ্ধাসহ পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধৃত হন এবং অনেকের সাথে তাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান রংপুর শহরের হাজীপাড়া নিবাসী এবং রেডিও বাংলাদেশের নিয়মিত অনুষ্ঠানকর্মী (FB: ৩ নভেম্বর ২০১৫ থেকে সংগৃহিত)।

শহীদ মুখতার ইলাহী : আমাদের গর্ব

কে. তউফিক ইলাহী

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী। ডাক - নাম চিনু (১৯৪৯-১৯৭১), আমার চাচা। গতকাল ২৮.১০.২০১৫ তারিখ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র-হলের নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে। অপচেষ্টা ছিল – বারবার, যেরকম 'ওরা' তাঁর নামে রাখা রংপুর শহরের একটি সড়কের নাম সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর-এর 'শহীদ মুখতার ইলাহী হল'

তাঁর সংগঠনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতা গুনে মুক্তিযুদ্ধকালীন খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রংপুর শহরে মুক্তি সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করেন এবং রংপুর অঞ্চলে গেরিলা বাহিনীর কমান্ড প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। সে সময়ে শহরের টাউন হল ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর একটি নির্যাতন কেন্দ্র। পাকিস্তানী সেনাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নানা বয়সী মহিলাদের সেখানে বন্দি করে রাখা হতো। এটি-ই শহীদ মুখতার ইলাহী'র শেষ

লালমনিরহাট মহকুমার বড়বাড়ির আইর খামার গ্রামে অবস্থান করছিলেন তখন 'ওরা' তাঁর বাহিনীর অবস্থান পাকিস্তানী হানাদারদের কাছে জানিয়ে দেয়। ৯ তারিখ অতি প্রত্যুষে দলটি পাক বাহিনীর এ্যামবুশ-আক্রমণে পড়েন। এই গ্রামে গণহত্যার ঘটনা ঘটে এবং ১১৯ জন গ্রামবাসী এবং মুক্তিযোদ্ধার সাথে মুখতার ইলাহী শাহাদাত বরণ করেন।

মুখতার ও তাঁর মত অসংখ্য শহীদ আমাদের একটি স্বাধীন দেশ ও একটি জাতীয় সত্ত্বা প্রদান করে গেছেন। আমরা এজন্য যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনি গর্বিত।

কে. তউফিক ইলাহী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক।

স্মরণীয় ও বরণীয় খোন্দকার মুখতার ইলাহী : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা

এবিএম রমজান আলী

খোন্দকার মুখতার ইলাহী শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, ছাত্র রাজনীতি এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী গণআন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। প্রথম সারির যে কয়েকজন যুবনেতা রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুখতার ইলাহী তাদের অন্যতম একজন ছিলেন। এজন্যই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়।

উত্তরের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত কারমাইকেল কলেজ, রংপুর-এর তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে কারমাইকেল কলেজ-এ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচিত হন এবং সক্রিয় একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় ভালো বক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ফলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহজে ভিপি পদে নির্বাচিত হন।

ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ সংসদ অধিবেশন ডেকে স্থগিত করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাদেশে হরতাল আহ্বান করলেন। রংপুরে হরতাল সফল করার জন্য মুখতার ইলাহী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। রংপুরের রাজনীতির ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন। লক্ষ মানুষের শ্লোগানে মুখরিত হয় রংপুরের মাটি। এ মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি।

২৮ মার্চ রোববার ১৯৭১ রংপুরে ঘটলো অবিস্মরণীয় ঘটনা। সাধারণ মানুষ সবাই যেন একেকজন নূরুলদীন। মুখতার ইলাহী, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, হারেস উদ্দিন সরকার, ইলিয়াস আহম্মেদ, মাহবুবুল বারী রংপুরে বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমিতি করে জনগণকে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের সময় পাকবাহিনীর গুলি বর্ষণে অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষিত হলে, মার্চের শেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি ত্যাগ করে ভারতে গমন করেন। কুচবিহারের সাহেবগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন।

সফল প্রশিক্ষণের পর মুক্তিবাহিনী রংপুর শাখার (গেরিলা) কমান্ডার নিযুক্ত হন। নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী ও লালমনিরহাটের বেশ কিছু সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন।

রংপুরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ পরিচালনার জন্য নির্দেশিত হয়ে তিনি ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ীর আইর খামার ডাকবাংলো প্রাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে রংপুরে বড় ধরনের আক্রমনের পরিকল্পনা করেন।

ইতোমধ্যে ডাকবাংলোয় মুক্তিযুদ্ধোদের অবস্থান ও সংগঠিত হওয়ার খবর পাক বাহিনীর কাছে চলে যায়। ৯ নভেম্বর ১৯৭১ খুব ভোরে পাক বাহিনীর একটি দল আইর খামার ডাকবাংলো আক্রমণ করে। সম্মুখ যুদ্ধে অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। সমাপ্তি ঘটে একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন সৈনিকের জীবন। শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে রংপুর পৌরসভা 'মুখতার ইলাহী স্মরণী' নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে। খোন্দকার মুখতার ইলাহী ১৯৪৯ সালে ২৬ মার্চ রংপুরের ধাপে জন্মগ্রহণ করেন।

৭ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ।

তাঁর পিতার নাম খোন্দকার দাদ ইলাহী, মায়ের নাম ছিল মরিয়ম খানম।

এবিএম রমজান আলী, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছেঃ প্রথম খবর ৯-৭-২০১২।

মুক্তিযুদ্ধে কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মত্যাগ

তৈয়বুর রহিম বাবু

'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার'। হ্যাঁ দুরন্ত দুর্বার যৌবনকাল জিম্মি করে সারা বিশ্বে বহু ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ৭১-মার্চ মাস চারদিকে টানটান উত্তেজনা। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। সবাই উত্তেজনায় ভরপূর কখন কি হয় কখন কি হয়। সেই সাথে গুজবের জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন। স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন সারাদেশ যখন উত্তাল সারাদেশসহ রংপুরে সরকারী কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক - ছাত্রছাত্রী ও কলেজের তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কেউ পিছিয়ে ছিল না। ৭১ সালে আমি স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। ভর্তি হওয়ার পর থেকে কলেজের ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের তুখোড় ছাত্র নেতাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে শহীদ মুখতার ইলাহী, অলক কুমার সরকার, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, আবুল মনসুর আহম্মদ, আব্দুল আউয়াল টুকু অন্যতম। বাবা সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়াতাম না। উপরোক্ত ছাত্র নেতাদের সহচার্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা ভাবনায় অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ি। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে সময়কার অন্যতম কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতা আসম আব্দুর রব, তোফায়েল আহম্মদ, শাজাহান সিরাজ, আবদুর রাজ্জাকসহ সব ছাত্র নেতারা সারা দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করতেন যেকারণে তাদের মতো দেশ বরেণ্য ছাত্র নেতাদের সঙ্গে স্বাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছিল।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে কারমাইকেল কলেজের সংসদ নির্বাচনে ছাত্র লীগের পুরো প্যানেল জয়ী হয় এবং এতে সহ-সভাপতি পদে শহীদ মুখতার ইলাহী ও সাধারণ সম্পাদক পদে আকবর হোসেন জয়ী হয়। পরবর্তি সময়গুলোতে শহীদ মুখতার ইলাহীর নেতৃত্বে কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা সংগঠিত হতে থাকে। উল্লেখ্য মার্চের প্রথম সপ্তাহের শুরু থেকে গোটা রংপুর আন্দোলনে উদ্বেলিত হতে থাকে এবং ৩রা মার্চ আলমনগরে অবাঙ্গালীদের গুলিতে শঙ্কু নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি চরম উত্তেজনাপূর্ণ হতে থাকে। শঙ্কু নিহত হওয়ার প্রতিবাদে শহরের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও জ্বালাও-পোড়াও ঘটে যায়। এর পরই এলো প্রতিক্ষীত ৭ মার্চের ভাষণ। এর পর থেকে পরিস্থিতি নাটকীয়

পট পরিবর্তন হতে থাকে। আমরা প্রতিদিন কলেজ ক্যাম্পাসে যাতায়াত করি, স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত অসহযোগ আন্দোলনে বন্ধ থাকতো। তারিখটা ঠিক স্বরণ নেই তবে মার্চেও ১৮/১৯ তারিখ হবে। আমি নাস্তা খেয়ে কলেজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় আমার ফুপাতো ভাই মরহুম ডাঃ পিনু আমাকে তাড়া দিল শীঘ্র কলেজ ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য। তড়ি ঘড়ি করে দু'জনে কলেজে হাজির হলাম। দেখি পূর্বেই অনেকে উপস্থিত হয়েছে। তখনো মোখতার ইলাহী আসেননি। সবাই উত্তেজনায় ভরপুর। কেন আমাদের ডাকা হয়েছে। সবার মুখে একই প্রশ্ন। কিছুক্ষণের মধ্যে উনি চলে এলেন। কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যায় তার মনের অবস্থা যেন একটা জলন্ত অঙ্গার। তিনি প্রথমেই খবর নিলেন যাদের যাদের খবর দেয়া হয়েছে তারা সবাই উপস্থিত হয়েছে কিনা। লক্ষ্য করলাম উপস্থিত সবাই চুপচাপ। কেউ বেশী কথা বলছেনা। আমি গণনা করে দেখলাম উপস্থিতির সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ জনের মতো। অল্পক্ষণ পর মুখতার ইলাহী ছোট্ট একটি বক্তব্য দিলেন। তার মূল কথা হলো এই মুহূর্তে এখানে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স নামে একটি কমিটি গঠন হবে। এর কাজ হবে মুক্তি যুদ্ধে স্থানীয় ছাত্র জনতাকে সংগঠিত করা। তোমরা কে কে রাজী আছ হাত তোল। উপস্থিত সবাই হাত তুলে সমর্থন জ্ঞাপন করলে অতি স্বল্পতম সময়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি হলো। যার আহবায়ক হলেন স্বয়ং মুখতার ইলাহী এবং কারমাইকেল কলেজের ফার্স্ট বিল্ডিং-এর থিয়েটার হল রুমের একটি কোণায় প্রকোষ্ট, সেখানে উপস্থিত সবাই নিজের আঙ্গুলে আলপিন ফুটিয়ে রক্তসাক্ষর করলেন তিনি। সবাইকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করান এবং কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে উল্লেখ করলেন। প্রথম দিনেই অভিযান হিসেবে প্রথম কলেজের রসায়ন বিভাগ ভেঙ্গে সব কিছু নেয়া হলো যাতে বোমা বানানোর কাজে লাগবে। উল্লেখ্য, বোমা ফাটাতে গিয়ে কলেজের মাঠে মুখতার ইলাহীসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বর আহত হয়েছিলেন। পর দিন কলেজের ইউওটিসি অফিস ভেঙ্গে সব ড্যামি রাইফেলগুলো লুট করে উপস্থিত সবাইয়ের মধ্যে বিতরণ করে সারিবদ্ধভাবে শহরাভিমুখে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে বর্তমান ট্রাক স্ট্যান্ডের কাছে কোতয়ালী পুলিশ সব কেড়ে নিয়ে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তৎকালীন কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজার রহমান। উল্লেখ্য উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা পাক সেনাদের সহযোগিতা ছিলেন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বহাল তবিয়তে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর পর হতে আমরা সবাই আমাদের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম এবং নির্দেশ মতো কাজ করতাম। উল্লেখ্য, আমাদের তিনজনের একটি

করে গ্রুপ ছিল। আমরা ছিলাম আমি ডাঃ কামরুল হাসান পিনু ও মুন্না (পুরো নাম এই মুহূর্তে স্বরণ নেই। সে বর্তমনে পুলিশ বিভাগে কর্মরত)। এর পর এলো কালো ভয়াল ২৫ মার্চ। সারা দেশে শুরু হলো গণহত্যা। আক্রান্ত হলো ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক ইপিআর হেড কোয়াটার ও পিলখানা। গভীর রাতে ঘুমন্ত বাঙ্গলী পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের গুলি করে হত্যা করা হলো। হত্যা করা হয় রংপুরের বাঙ্গালী পুলিশ ইপিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো তার ৩২ নং বাসভবন থেকে। উল্লেখ্য গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ওয়ার্লেস মারফত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শুরু হয়ে যায় সারা দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ জনাব নাসিম সাহেব, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব জাহাঙ্গীর সাহেব, শহীদ কালাচান্দ, অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন, অধ্যাপক শুকচাঁদ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক পাকসেনাদের হাতে শহীদ হন। ছাত্রীদের মধ্যে মমতাজ, দোরাসহ তিন বোন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ছোট বোনের নাম স্বরণ নেই, এরা সবাই কারমাইকেল কলেজের ছাত্রী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মেয়েরা বিভিন্ন ক্যাম্পে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছিল।
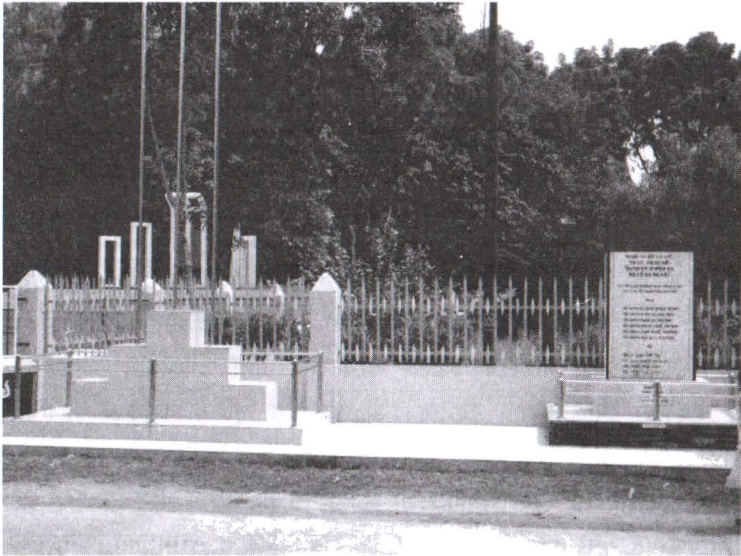
কারমাইকেল কলেজের শহীদ শিক্ষক এবং ছাত্রদের স্মরণে স্মৃতি ফলক (নতুন)

উল্লিখিত ছাত্রনেতারা ছাড়াও বহু ছাত্র মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। সৈয়দ মকসুদার রহমান পান্না, তাজিবুর রহমান লাইজু, মুকুল মোস্তাফিজার রহমান, মোজাফফর হোসেন চান্দ, ডাঃ পিন্নুসহ অনেক ছাত্র। আজ এই মহান স্বাধীনতার মাসে সেসব জানা-অজানা ছাত্র-ছাত্রীদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। সেই সাথে কারমাইকেল কলেজের শহীদ শিক্ষক-ছাত্রদের আত্মার শান্তি কামনা করি। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

যুগের আলো, ১১ মার্চ ১৯৯৯ থেকে সংকলিত।

রংপুরের প্রথম শহীদ কিশোর শংকু

আরিফুল হক রুজু

'৭১ সালের ৩ মার্চ। রংপুরের ইতিহাসে এক অনন্য দিন। সেদিন বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠেছিল রংপুরের হাজার হাজার বীর জনতা। প্রতিবাদের ঝড়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রংপুর শহর। ওইদিন সমগ্র দেশে ছিল হরতাল। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শহরে একটি জঙ্গি মিছিল বের করা হয়। এই মিছিল রাস্তায় বের হওয়ার পর শহরের বাসাবাড়ি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা মিছিলে অংশ নেয়। কণ্ঠে তাদের অগ্নিঝরা স্লোগান, 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা–মানি না মানব না, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। সেই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন রনি রহমান, মুখতার ইলাহী, শেখ শাহী, অলক সরকার, মোসলেম উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, খন্দকার গোলাম মোস্তফা বাটুল, হারেছ উদ্দিন সরকার, তবিবুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া, হালিম খাতুন, আবু আলম, নূরুল রসুল, সিদ্দিক হোসেন, ইলিয়াছ আহমেদ, লুলু, সাবুসহ নাম না জানা অসংখ্য বিদ্রোহী ছাত্র-জনতা।

১২ বছরের এক দুরন্ত কিশোর শংকু সেই মিছিলে গিয়েছিল। তখন সে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। মায়ের বাধা উপেক্ষা করে সে-ও মিঝিলের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতে যায়। শহরের পাবলিক লাইব্রেরির মাঠ থেকে অগ্নিঝরা মিছিল দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিশোর শংকু আলমনগরের নেছার আহমেদ শরফরাজ খানের বাড়ির সামনের উর্দু লেখা সাইনবোর্ডটি নিজেই নামিয়ে ফেলতে যায়।

এরপর বাড়ির দোতলা থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। রাস্তায় ঢলে পড়ল শংকুর শরীর। শংকুকে কোলে করে হাসপাতালের দিকে ছুটলেন মিছিলেরই একজন মুসলিম উদ্দিন। কিন্তু ততক্ষণে তার প্রাণপ্রদীপ নিভে যায়। আরেকজন গুলিবিদ্ধ মকবুলকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর এপ্রিলের মাঝামাঝি তার মৃত্যু ঘটে। মারা যায় ওমর আলী নামের আরো একজন।

সেদিনের সেই ঘটনা প্রাসঙ্গে বিস্তারিত কথা হয় ওই মিছিলের নেতৃত্বদানকারী একজন মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম গোলাপের সঙ্গে। তিনি ওই দিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ২ মার্চ রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি আবদুর রউফের সঙ্গে অনেকক্ষণ বৈঠক করলাম শহরের সেন্ট্রাল রোডের পাঙ্গা হাউসের ছাদে (অগ্রণী ব্যাংক সংলগ্ন পশ্চিম দিকের ফাঁকা জায়গায় পাঙ্গা জমিদার বাড়িটি, যা বর্তমানে ভেঙে ফেলা হয়েছে)। রংপুর জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি হিসেবে আমি ও সাধারণ সম্পাদক মমতাজ, জাকির আহমেদ, সাবু, হারেছ উদ্দিন সরকার, আবুল মনসুর আহমেদ, আবদুল বারি, মুখতার ইলাহীসহ অনেকে ছিলেন। ৩ মার্চের হরতালে পিকেটিং করতে হবে না ভেবে অনেক বেলা পর্যন্ত রংপুর কলেজের ছাত্রাবাসে ঘুমিয়ে সকাল ৯টায় বের হই। আমি, হারেছ উদ্দিন সরকার, নুরুল হাসান (প্রয়াত), আবুল মনসুরসহ বেশ কয়েকজন সেন্ট্রাল রোডে গোবিন্দ দা'র (প্রয়াত) চায়ের দোকান নিরালায় নাশতা সেরে কাঁচারি বাজারের দিকে হরতালের পক্ষে পিকেটিং করার উদ্দেশে রওনা দিই। পথে কোনো যানবাহন নেই। এমনকি বাইসাইকেলও চোখে পড়ল না। দোকানপাট-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো খুলেইনি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করছেন। কাঁচারি বাজারে এসে দেখি কোনো সরকারি অফিসের ভেতর কেউ নেই। সবাই অপিসের সম্মুখ ভাগে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির ওপর বিভিন্ন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এবং আমাদের দেখামাত্র ছুটে এসে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজখবর জানতে চান। এর মধ্যে সকাল ১০টা বেজে গেল। একটা মিছিল করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। কিন্তু সমস্যা হলো আমরা মাত্র ছয়-সাতজন। মিছিল আরম্ভ করতে বা স্লোগান দিতে বেশ কিছু মানুষ প্রয়োজন। কিছুটা ইতস্ততবোধ করে ছয়-সাতজনই স্লোগান শুরু করলাম।

আমরা মিছিল শুরু করার পর অল্প কিছু দূর যেতেই প্রায় শতাধিক অপরিচিত লোক মিছিলে যোগ দিল। ফলে ক্রমান্বয়ে মিছিলে জঙ্গিভাব আসছিল। এমনি করে যাওয়া হলো পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে। এরপর একে একে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনতা জড়ো হতে থাকেন সেখানে। পাবলিক লাইব্রেরির মাঠ থেকে মিছিলটি বের হয়ে রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে আরো মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ে। অবশেষে মিছিল পরিপূর্ণ জঙ্গি মিছিলে রূপান্তর হলো। সম্মুখভাগ থেকে মিছিল নিয়ন্ত্রণ মুশকিল হচ্ছিল। প্রেসক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছিলে অসংখ্য মানুষ হাততালি দিয়ে মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে সিদ্দিক হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলে যোগ দেন। তাদের মধ্যে অলক সরকারও ছিল। সে সময় বাংলার বাণীর সাংবাদিক মুকুল মোস্তাফিজকে

প্রেসক্লাবের ছাদ থেকে ছবি তলতে দেখলাম। অনেক লাফিয়েও মিছিলের শেষ প্রান্ত দেখতে পারলাম না। গগণবিদারী স্লোগান দিয়ে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল তেঁতুলতলা অভিমুখে। তেঁতুলতলা থেকে মিছিল পুনরায় শহরের অভিমুখে ফেরানোর পরামর্শ দিলেন কারমাইকেল কলেজের ছাত্রনেতাদের মধ্যে মুখতার ইলাহী, জিয়াউল হক সেবু, জায়েদুল ইসলাম এবং আলমনগর এলাকার আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে মিছিলের গতি আলমগর স্টেশন অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

তেঁতুলতলা শ্রমিক এলাকা হওয়ায় এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মিছিলের বিশালত্ব এমন পর্যায়ে দাঁড়াল যে দৌড়ানো ছাড়া মিছিলের সম্মুখভাগে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। মিছিলের অগ্রভাগ যখন খাদ্য গুদামে পৌঁছেছে তখন আচমকা মিছিলের মধ্যভাগে গুলির শব্দ শোনা গেল। অনুমান করলাম মিছিলকারীরা হয়তো কেউ পটকা ফাটিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আমার ভুল ভাঙল। খবর এল পাশের এক বাড়ি থেকে গুলি করা হয়েছে এবং একটি কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। তখন মিছিল দ্বিধাবিভুক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম উদ্দিন (সাবেক পৌর কমিশনার) গুলিবিদ্ধ কিশোরকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। পথিমধ্যে কিশোরের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ দেখে জনতা উত্তেজিত হয়ে সারা শহরে অবাঙালীদের দোকানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। যে বাড়ি থেকে গুলি করা হয়েছিল সে বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা কালে ইপিআর বাহিনী এসে বাধাদান করে। শরফরাজ খানের বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়েছিল। ইপিআর বাড়িটি ঘিরে রাখল। পরে সেখানে একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে সুন্দরগঞ্জের এমএনএ ডা. সোলায়মান মন্ডল এক জালাময়ী বক্তৃতা দেন। প্রশাসণ শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সান্ধ্য আইন জারি করে।

দুপুর আড়াইটায় সদর হাসপাতালে আমিসহ অনেকে গিয়ে জানতে পারি ওই কিশোরটি মারা গেছে। সে বিধাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের নাম দিপালী সমজদার। বাড়ি গুপ্তপাড়া। হাসপাতালে আরো দু'জন বাঙালীর মৃত্যুর খবর পেলাম। একজন গিনি এক্সচেঞ্জের সম্মুখে জৈনিক অবাঙালী গুলিতে হত হয়েছে। নাম আবুল কালাম আজাদ। অপরজন জেনারেল বুট হাউসের সামনে ছোরার আঘাতে মৃত্যবরণ করেছেন। নাম ওমর আলী। তাদেরও লাশ দেখলাম। এর মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন নূরুল হক, সিদ্দিক হোসেন এবং তৈয়বুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ।

রংপুরের প্রথম শহীদ শংকু। তার বুকের তাজা রক্ত রংপুরের মাটিতে পড়ে জন্ম দেয় নতুন মাতৃভূমির। সেদিনের সেই ঘটনা ও রংপুরের মানুষের ত্যাগ কোনো দিনও ভোলার নয়।

আরিফুল হক রুজু : 'প্রথম আলো'র রংপুর প্রতিনিধি।

’৭১-এর দিনে রংপুরবাসী লাঠি তীর ধনুক নিয়ে পাক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

মানিক সরকার মানিক

আজ ২৮ মার্চ রংপুরের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। ’৭১-এর আজকের এ দিনে রংপুরের বীর বাঙ্গালীরা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়েছিল। বাঁশের লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে রংপুরের বীর জনতা সেদিন পাক হানাদার বাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে আক্রমণ করেছিল। সেদিনের সেই আক্রমণ অভিযান যদি সফল হতো তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস ও হয়ত অন্যভাবে লেখা হতো। প্রতি বছরের মতো এ বছর দিনটি উপলক্ষ্যে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ এবং নিশবেতগঞ্জ এলাকাবাসী বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। ঐদিনের পূর্বরাতে সংগ্রাম কমিটি গঠন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা ব্যস্ত ছিলেন কি করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া যায় তার কৌশল নির্ধারণ নিয়ে। ২৩ মার্চ বাঙ্গালীদের বিক্ষুব্ধতার শিকার হয় তৎকালে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত অবাঙ্গালী আর্মি অফিসার আব্বাসী ও তার সাথে আরও কয়েক পাকি সৈন্য। সেদিন নিশবেতগঞ্জে কাছে এক নিচু জমিতে পাক আর্মি আব্বাসীর জীপ গাড়ি থেকে ফেলে তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর পাক সেনারা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা তৈরি করে বাঙালী গণহত্যার নীলনক্সা। রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সহযোগিতায় তারা মেতে ওঠে হত্যার তান্ডবে। সেদিনের সেই অভিযানে যাঁরা ছিলেন তারা হলেন আব্দুর রউফ, আব্দুল হান্নান, বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ। তাঁরা আব্বসীকে হত্যার পর তাদের ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেন। এরপর সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা অস্ত্র ফেরত না দিলে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার হুমকি দিলে আওয়ামী লীগ নেতা সিদ্দিক হোসেন, নুরুল হক, শেখ আমজাদ অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে ফেরত দেন। কিন্তু অস্ত্র ফেরতের পরও তাদের তান্ডব থেকে রক্ষা পায়নি গ্রামবাসী। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ক্যান্টনমেন্টের পাশের গ্রাম নিশবেতগঞ্জ-দামোদরপুরের বেশ কিছু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একই সাথে ৩২ জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জুমার নামাজের পর লাহিড়িরহাটের কাছে হত্যা করে। এ ঘটনার পর মানুষের বিক্ষুব্ধতা বেড়ে যায়। বিক্ষুব্ধ মানুষজনকে সংগঠিত করেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সিদ্দিক হোসেন, আব্দুল গনি, মরহুম তৈয়বুর রহমান, মুকুল মোস্তাফিজ, মুখতার ইলাহী, শেখ

আমজাদ, আবুল মনসুর, মজিবর রহমান, ইসহাক চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল টুকু, মোঃ শামছুজ্জামান প্রমুখ। এর আগেই জনসভায় ঘোষণা দেয়া হয় পাক ক্যান্টনমেন্টে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেবার। এ ছাড়া গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে অবাঙ্গালীদের বন্দী করে ক্যান্টনমেন্ট দখল করার। সে সময় এই পরিকল্পনা গোপনে বাস্তবায়ন করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বসে যিনি কাজ করছিলেন তিনি ক্যাপ্টেন নোওয়াজেশ। পরবর্তীতে তাঁকে বিএনপি'র আমলে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

জনকণ্ঠ। ২৮-৩-২০০১।

'৭১-এর গণকবর-বধ্যভূমি : রংপুর

সুকুমার বিশ্বাস

রংপুরে ছিল ১০ নম্বর ইপিআর উইং হেড কোয়ার্টার। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ছিলেন এই উইং-এর সহকারী উইং কমান্ডার। যুদ্ধের ঊষাকালেই তিনি তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। সেক্টর গঠিত হলে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি গোটা মাসগুলোতে। রংপুর শহরেই ছিল পাকিস্তান সেনাবহিনীর ২৩তম ব্রিগেড। হেডকোয়ার্টার ব্রিগেডটি কমান্ড করছিলেন বিগ্রেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক। এই ব্রিগেডের অধীনেই ছিল ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৬ এফ এফ রেজিমেন্ট, ২৩ ক্যাভেলরি, ২৯ ট্যাঙ্ক বাহিনী প্রভৃতি। ২৩শে মার্চ পাকিস্তানী সেনা অফিসার অবাঙালী লেঃ আব্বাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রংপুর এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা সেদিন এই পাকিস্তানি অফিসারকে হত্যা করে তার সঙ্গের পাঁচজন সৈনিকের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল। যদিও সেদিন নেতৃবর্গ অস্ত্র উদ্ধার করে সেনানিবাসে ফেরত পাঠিয়েছিল - কিন্তু তারপরও জনতা রেহাই পায়নি। পাকিস্তানীরা হত্যা করেছিল অসংখ্য গ্রামবাসীকে। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, গ্রামবাসীরা দা, কুড়াল, তীর ধনুক নিয়েই রংপুর সেনানিবাস আক্রমণের মতো দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে আসে। সেনানিবাসে পাকিস্তানীরা পূর্ণ সামরিক সম্ভার নিয়ে এ সময় প্রস্তুত হয়েছিল। বাঙালি সেনারা হলো বন্দী। এদিকে সেনানিবাস আক্রমণ করা হলে সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙালি সেনারাও জনতার সঙ্গে যোগ দেবে এমন একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংবাদে জনতা আরো সাহসী - আরো জঙ্গী হয়ে সেনানিবাস অভিমুখে রওনা হয়। সেদিন ছিল ২৮শে মার্চ। মাহবুব রহমান উল্লেখ করেছেনঃ '- ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের পরিস্থিতি নেতাদের কাছে পৌছে যাওয়ার আগেই গ্রামের হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ তীর-ধনুক-বল্লম-লাঠি-দা-কুড়াল আর বাঁশের লাঠি হাতে ক্যান্টমেন্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিশবেতগঞ্জ হাট ও তার আশপাশ এলাকাসহ ঘাঘট নদীর তীর ঘেঁষে জমায়েত হতে থাকে। দুপুর না হতেই সমস্ত এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই সম্মুখ লড়াইয়ে সেদিন সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল মিঠাপুকুর অঞ্চলের উপজাতীয় সাঁওতাল তীরন্দাজ বাহিনীর। এই আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত জনতাকে সেদিন কেউ ফেরাতে পারেনি। তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করে। এদিকে সমস্ত ক্যান্টমেন্ট ঘিরে সমর অস্ত্র প্রস্তুত করে আক্রমণের অপেক্ষায় বসে আছে পাক সেনারা। এই অবস্থার মধ্যে মুখোমুখি অগ্রসর হচ্ছিল তীর ছুড়তে ছুড়তে সাঁওতাল তীরন্দাজ বাহিনী। এমন সময় গর্জে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে আগ্নেয় অস্ত্রের গুলি। পাখির মতো লুটিয়ে পড়তে থাকে জনতা। বিক্ষুব্ধ মানুষের স্রোত তবুও অগ্রসর হতে থাকে। এক সময় দেখা

নিশবেতগঞ্জে গণহত্যা স্থলে শহীদের সম্মানে স্মৃতিফলক

গেল লাশের পর লাশ পড়ে আছে সমস্ত পথ-মাঠ ক্ষেতের ফসলের উপর। ঘাঘট নদীর পানি শত শহীদের রক্তে লাল হলো। ব্যর্থ হলো বিক্ষুব্ধ জনতার ক্যান্টনমেন্ট দখলের লড়াই। কয়েকদিন এই বীর যোদ্ধাদের লাশ খোলা আকাশের নিচে পড়েছিল। কিন্তু লাশ কবর দেয়া হলেও সবার ভাগ্যে তা জোটেনি। সেদিন প্রকৃতপক্ষে কতজন শহীদ হয়েছিল তা আজও জানা যায়নি। সেদিনের প্রত্যাক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে এ শহীদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিকের নিচে নয়। কারণ অনেক লাশ পাক সেনারা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। তবে সবচেয়ে বেশি শহীদের লাশ পড়েছিল ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম সীমান্ত রেখার কাছে নালার দীঘিতে। পরে এই ঘাঘট নদীর তীর হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বধ্যভূমি।' আদিবাসী সাঁওতাল তীরন্দাজদের কথা, গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা যারা সেদিন দেশের মাটির জন্য রক্ত দিল - প্রাণ দিল তাদের কথা কি আজ আমাদের মনে পড়ে?

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী সমগ্র রংপুর জেলায় লক্ষাধিক বাঙালিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা হত্যা করেছে বলে জানা যায়। নূন্যতম দশ হাজার মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করেন। এই জেলার পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজার বাড়িঘরও ধ্বংস করা হয়ে। রংপুর সেনানিবাসের পাশেই রয়েছে একটি গণকবর। এই গণকবরটি থেকে স্বাধীনতার পর প্রায় দশ হাজার মানুষের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়। এখানে যেসব লাশ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর সদস্যদের সংখ্যা ছিল দুইশত। এখানেই হত্যা করা হয় সৈয়দপুরের এমসিএ ডাঃ জাকিরুল হক-কে। ১২ই এপ্রিল সৈয়দপুর থেকে বিপুল সংখ্যক মাড়োয়ারিকে ধরে এনে এই স্থানটিতে

হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছিল। শহরের মডার্ণ সিনেমা হলের পিছনে রয়েছে গণকবর। ১লা মে ১৯ জন বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিককে সেনানিবাস থেকে বের করে এনে রাত বারটার দিকে সাহেবগঞ্জের বধ্যভূমিতে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হয়।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে দু'মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দমদমা সেতুর নিচে ছিল বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমিতেই ৩০শে এপ্রিল কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক রামকৃষ্ণ অধিকারী, কালাচাঁদ রায়, সুনীল বরণ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন রায়সহ আরো কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। প্রায় প্রতিদিনই এখান অসংখ্য মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হতো।

রংপুরের নিশবেতগঞ্জ বধ্যভূমির নাম করলে আজো মানুষ ভয়ে আঁৎকে ওঠে। নিশবেতগঞ্জ সেতু এলাকা সেখানেই পা দেয়া যায় সেখানেই মানুষের মাথার খুলি, দেহ, কঙ্কাল। পীরগঞ্জের তহশিলদার আহমদ আলী দেখেছেন অসংখ্য মানুষকে হত্যা করতে। নিশবেতগঞ্জের সেতুর কাছে বসবাসরত মেহেরউদ্দিন ও তার ছেলে এহসানউদ্দিন ৭২-এ জানিয়েছিলেন ঃ 'পুলের কাছে রাস্তার দক্ষিণ দিকে ১লা এপ্রিল রাত ১১টায় একে একে ১২ জনকে হত্যা করা হয়। উত্তর দিকে অপর একটি স্থানে ৫০ জনকে, সাতগাড়া ইউনিয়নের ৩২ জনকে, নাড়িয়াহাটের ১৫০ জনকে জুম্মার নামাজের পর দিনের বেলায় হত্যা করা হয়। জাফরগঞ্জ পুলের কাছে একদিন ৭ জন আর একদিন ৩ জনকে এবং উলাসুর সেতুর কাছে বাঙালি ইপিআরসহ ৫০ জনকে হত্যা করা হয়'।

রংপুর সেনানিবাস এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আর্টস কাউন্সিল ভবনটি নারী নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কয়েকশত যুবতীকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রেখে প্রতিদিন চালানো হতো তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার। যারা এসব অত্যাচারে অসুস্থ হযে পড়তো তাদেরকে হত্যা করা হতো। দেশ স্বাধীন হবার পর আর্টস কাউন্সিল হলের পাশে বহুসংখ্যক মহিলার কঙ্কাল, অর্ধগলিত লাশ, ব্লাউজ, শাড়ি ও ব্রেসিয়ার পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, রংপুর থেকে ৩/৪শ' সুন্দরী মহিলাকে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে খানসেনা অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য পাচার করে দেয়া হয়েছে। এদের খোঁজ আজও মেলেনি। গ্রামে গ্রামে অভিযান চালাতে গিয়ে জল্লাদেরা নিয়মিতভাবে বাড়িতে ঢুকে নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতো।

পাগলাপীর এলাকা, দেবীপুর, রংপুর শহর উপকণ্ঠের কুকরুলবিল, সেনানিবাস নিম্নভূমি, শিবগঞ্জ এলাকা, ঘাগট নদীর তীরসহ অসংখ্য এলাকায় ছিল বধ্যভূমি আর গণকবর। 'দৈনিক বাংলা' প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম ৭২-এর গোটা রংপুর জেলাটিকেই বধ্যভূমি

হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি সেদিন লিখেছিলেন ঃ 'গোটা জেলায় প্রতিটি শহরে, মহকুমায়, থানার আনাচে-কানাচে কত যে বধ্যভূমি আছে তার অন্ত নেই। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ নয় সেখানে শত শত এমন কি হাজার হাজার লোককে মেরেছে এমন বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে উল্লেখ করার মতো রংপুর শহর ও সদর মহকুমার নাবিরহাট, জাফরগঞ্জের পুল, নিশবেতগঞ্জ, বৈরাগীগঞ্জ, দমদমা, বলদি পুকুর, মাহিগঞ্জ শ্মশান ঘাট, সাহেবগঞ্জ এবং রংপুর শহরের মর্ডাণ সিনেমা হলের পিছনে এবং দেবীপুর। এসব এলাকার মানুষের হাড়গোড় অসংখ্য পড়ে আছে। ভাল করে খনন করা হলে শত শত নয় হাজার মানুষের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যাবে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে কুকরুল বিলে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে'।

মর্ডাণ সিনেমা হলের পিছনের বধ্যভূমি থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন একজন রিকশাচালক। পাক সেনাদের দালাল জব্বার নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে এই রিকশাচালককে ন্যাপের কর্মী বলে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানীদের কাছে সোপর্দ করে। তাকে আটক রাখা হলো মডার্ণ সিনেমা হলে। এই হলে তখন ৩৪০ জনের মতো আটক ছিল। তোরো দিন ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো বধ্যভূমিতে। তিনি জানিয়েছেন তার সামনেই রাত দশটার দিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে একে একে জিনকি মালেকা, আলী হোসেন, ফারুক প্রমুখকে জবাই করে হত্যা করা হয়। রাতের অন্ধকারে এসব হতভাগাকে যখন জবাই করছিল তখনই রিকশাচালক হত্যাকারীদের চোখেকে ফাঁকি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

রংপুর শহরের কাছে মাহিগঞ্জ শ্মশানঘাট বধ্যভূমি থেকে অলৌকিভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন মন্টু ডাক্তার। সবার মন্টুদা। ৩রা এপ্রিল, রংপুর সেনানিবাসের দু'টি সেল থেকে বের করে ১১ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় মাহিগঞ্জ শ্মশানঘাট বধ্যভূমিতে। এই দলে মন্টু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন রংপুরের জনপ্রিয় ভাসানী ন্যাপ নেতা ইয়াকুব মাহফুজ আলী। তিনি সবার কাছে জররেজ মিয়া নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। ৭২-এর ৩ই ফেব্রুয়ারি ভাগ্যবান মন্টু ডাক্তারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন 'দৈনিক বাংলা' প্রতিনিধি। সবার মন্টুদা প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন ঃ 'রংপুরে দ'জনের যখন দেখা হলো তখন শেষ মুহূর্ত। শেষ যাত্রা। ৩রা এপ্রিল, রংপুর ক্যান্টনমেন্টের পৃথক দু'টি সেল থেকে অন্যদের সাথে বের করে আনা হলো আমাদের। রাত তখন বারোটা, জল্লাদ বাহিনীর পশুরা মাহিগঞ্জের শ্মশানে নিয়ে বসিয়ে বকরির মত হাত বেঁধে এলোপাতাড়ি গুলি করে। সেল থেকে বেরিয়ে ভাসানী ন্যাপ নেতা রংপুরের জনপ্রিয় ইয়াকুব মাহফুজ আলী (জররেজ ভাই) আমার গা ঘেঁষে গাড়িতে বসে কাঁদছিল আর বলছিলো শেষবারের মতো যদি একটি ছেলেকে দেখতে পারতাম।

৩রা এপ্রিলের পরদিন জররেজ ভাইকে সনাক্ত করে যখন বাড়িতে নেয় হয়, তখন তার পকেটে ছেলেকে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। প্রাণে বেঁচে আছি ......'।

পাক বাহিনীর জল্লাদরা তার শরীরের উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার। মেরে মেরে তার শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে দেয়া হয়। তার লাশ দেখে মনে হয়েছিল কতদিন না খাইয়ে রেখেছিল তাকে পশুরা।

'আমাদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি করা শেষ হলে বুঝতে পারলাম আমি জীবিত আছি। হাতের দড়ি খোলার কথা ভাবছি। মরার ভান করে আছি। সার্চ লাইট জ্বালিয়ে তারা আবার দেখলো। পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে হো হো করে হাসলো। এক এক করে তিনটি গাড়িই যখন স্টার্ট দিয়ে চলে গেল তখন আমি উঠে বসলাম। সকলকে (দশজন) এক এক করে নাম ধরে ফিস ফিস করে ডাকলাম। কিন্তু কারো উত্তর নেই। আমার একটুও ভয় করছিল না। কেননা এ শ্মশানে আমি কত লোক পুড়িয়েছি....। আমার উপর শোয়া ছিল জররেজ ভাই। হাতের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।'

সবার প্রিয় জররেজ ভাই নেই - আছেন মন্টুদা। কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক রামকৃষ্ণ অধিকারী নেই - বেঁচে আছেন তার সহকর্মী রেজাউল হক। অথচ রামকৃষ্ণ অধিকারীই তার বন্ধু সহকর্মী রেজাউল হককে হাসির ছলেই হয়তো বলেছিলেন: 'আবার গোলাযোগ হলে আমাদের পালানোর জায়গা আছে। ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেবো বেঁচে যাবো। ভাই আপনারা যাবেন কোথায়? আপনাদের যে কোন পথ রইলো না।' স্বাধীনতার পর এ কথাগুলো বলেছিলেন দুঃখভারাক্রান্ত শিক্ষক রেজাউল হক। একেই কি বলে নিয়তি? বিধিলিপি?

'সংবাদ' ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত (সংক্ষেপিত)।

যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ : রংপুর শহর
শহীদুল ইসলাম বাবুল

মহাণ মুক্তিযদ্ধে অন্যান্য স্থানের মত আমরাও হারিয়েছি রংপুরের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। পাক হানাদার এবং রাজাকার বাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েছেন অনেক মা-বোন। টাউন হলসহ অনেক নির্যাতন কেন্দ্রে অনেক বাঙ্গালী ভাই-বোন সহ্য করেছেন অমানবিক নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধে সাহসের সংগে লড়াই করেছেন রংপুরের জনগণ। সৃষ্টি হয়েছে অনন্য ইতিহাস। আমাদের সংগৃহীত রংপুর পৌর এলাকার শহীদদের তালিকা এখানে প্রকাশ করা হল।

১নং ওয়ার্ড

১। **এ, ওয়াই, মাহফুজ আলী জররেজ মিঞা,** মুন্সীপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার কর্তৃক নিহত হন। ২। **কে, মুখতার ইলাহী,** ধাপ, রংপুর। রংপুর জেলা ছাত্র লীগের নেতা, ১৯৭১-এর পূর্বে কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ছাত্র সমাজের প্রাণপ্রিয় এই নেতা মেধারী ছাত্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রংপুরে কয়েকটি সফল অপারেশন শেষ করেন। এরূপ এক অপারেশনে রংপুর যাওয়ার পথে ৯ নভেম্বর লালমনিরহাটের বড়বাড়িতে শহীদ হন। ৩। **মিলি চৌধুরী,** পিতাঃ কাজি মোঃ ইলিয়াছ, মুন্সীপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে রংপুর আসার পথে টাঙ্গাইলের পাকুল্লা গ্রামে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। ৪। **শাহ আব্দুল মজিদ,** পিতাঃ জনাব ইউনুস, কেরানীপাড়া, রংপুর। ১৯৭১-এ রাজশাহীর পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় পাক সেনাবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ৫। **আনোয়ারুল ইসলাম,** বয়স ২৩ বছর। পিতাঃ আঃ লতিফ, মুন্সীপাড়া, রংপুর। চিটাগাং হিলট্রাক্টস-এ ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ৭ নং সেক্টরের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে নিখোঁজ হন। ৬। **সহিদুর রহমান বাফাত,** বয়স ২৪ বছর, পিতাঃ মোঃ সমসের আলী, মিস্ত্রীপাড়া, মুন্সীপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ৭ মে শুক্রবার বেলা ১টার সময় লাহিড়ীহাট পুকুর পাড়ে পাক হানাদারবাহিনী কর্তৃক আরো ৩২ জনসহ নিহত হন। ৭। **চাঁদ মিঞা,** বয়স ২৪ বছর, পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ আলী, মিস্ত্রীপাড়া, মুন্সীপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ১৪ আগষ্ট রংপুরের লক্ষ্মী সিনেমা হলের সামনে থেকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায় এবং সেই দিন থেকে নিখোঁজ হন। ৮। **সেকেন্দার,** বয়স ২৭ বছর, পিতাঃ আব্দুল মান্নান, কেরানীপাড়া, রংপুর। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন সময় তিনি বাসায় এসেছিলেন তাঁর মাকে দেখতে।

এ সময় রাজাকার বাহিনীর চররা খবর দিলে পাক হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং সে দিন থেকেই তিনি নিখোঁজ হন। **৯। মোঃ সবদার আলী,** বয়স ২২ বছর, রামপুর, রংপুর। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ হন। **১০। ঘুটু মিঞা,** মুন্সীপাড়া, রংপুর। **১১। হেছাব আলী,** মুন্সীপাড়া, রংপুর। **১২। রাবেয়া খাতুন,** স্বামীঃ মৃত এস, এম, আঃ বারী কেরানীপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর আনুমানিক চারটার সময় বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হন। **১৩। জনাব কাচু,** ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ১৯৭১-এর মাঝামাঝি সময় পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিশবেতগঞ্জের নিকট নিহত হন। **১৪। দূর্গাদাস অধিকারী**, ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **১৫। উত্তম কুমার,** পিতাঃ দূর্গাদাস অধিকারী, ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **১৬। দুলাল,** পিতাঃ বছির উদ্দিন, ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **১৭। মোঃ মহরম** (বছির উদ্দিনের জামাই), ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **১৮। রফিক আলী,** পিতাঃ আহমেদ। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ দহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **১৯। ক্ষিতীশ হাওলাদার,** ধাপ, ব্যাপটিষ্ট চার্চ, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। **২০। গোপাল,** ধাপ, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত। শ্যামপুর অঞ্চলের এক বৃদ্ধসহ আরো দু'জন একই দিনে মাহিগঞ্জ শ্মশানে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। এদের নাম এবং অন্যান্য তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

২নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার, লিচু বাগান, রংপুর। অশতিপর বৃদ্ধ এই আইনজীবীকে ১৯৭১ সালের ২৬ মে গভীর রাতে পাক হানাদাররা ধরে নিয়ে যায় এবং ঘাঘট নদীর ধারে শানকামারীতে মেরে ফেলে। **২। রনী রহমান,** বয়সঃ ২৩ বছর। পালপাড়া, রংপুর। ২৭ মার্চ কুষ্টিয়া সেক্টরে পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। **৩। ওমার আলী,** পিতাঃ আতোয়ার ঢালী, মূলাটোল, রংপুর। ২৬ মে ১৯৭১ সালে রাত ১১-৩০ মিনিটে নিজ বাড়ি থেকে পাক হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। **৫। শৈলেশ চন্দ্র দত্ত,** পিতাঃ মৃত ভোলানাথ দত্ত বয়স ১৫ বছর। ২৬ মে ১৯৭১ সোমবার রাত ১১-৪৫ মিনিটে বাড়িতে ধরার পর তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে জীপের পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে নজীরহাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ হন।

৬। **সন্তোষ মিত্র,** বয়স ৪৫ বছর, পেশাঃ চাউলের ব্যবসায়ী, গোমস্তাপাড়া, রংপুর। জাতীয় পতাকা নিজ বাড়িতে তোলার সময় সাধারণ পোশাকধারী পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে নিয়ে যায়। তিনি তখন থেকে নিখোঁজ হন। ৭। **বৈদ্যনাথ রায়,** বয়স ৩৭ বছর, পালপাড়া, রংপুর। পেশা জজকোর্টের চাকরিজীবি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পাক হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে তাকে হত্যা করে। ৮। **শইজ উদ্দিন মিয়া,** পেশাঃ চাউলের ব্যবসায়ী, গোমস্তপাড়া, রংপুর। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খবর সরবরাহ করতেন। যুদ্ধ চলাকলীন সময় পাক হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে। স্থানীয় রাজাকার কাম্মু তার গ্রেফতারে সহযোগিতা করে। ৯। **নুরুল ইসলাম ঢালী,** বয়স ১৯ বছর, পালপাড়া, রংপুর। সাহিত্য অনুরাগী, চিত্র শিল্পী, নাট্যকার ও সাংবাদিক। মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে সংবাদ সরবরাহ করতেন। ১০ আগষ্ট ১৯৭১ রাতে লাহিড়ীর হাটের ইট ভাটার নিকট নিহত হন। ১০। **ভিখু চৌধুরী,** পিতাঃ মৃত মাজীর উদ্দিন চৌধুরী, সেনপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে রংপুর আসার পথে টাঙ্গাইলের পাকুল্লা গ্রামে সস্ত্রীক পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। ১১। **আশ্বিনী কুমার ঘোষ,** বয়স ৪০ বছর, পিতাঃ মৃত ফটিক চন্দ্র ঘোষ। গোমস্তপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল আশ্বিনী কুমার ঘোষের সাথে শহর ত্যাগ করার সময় পুরাতন রেডিও সেন্টারের নিকটে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধৃত হন এবং তারা নির্যাতন করে জাফরগঞ্জের পুলের নিচে হত্যা করে। ১৩। **রবী,** বয়স ১৮ বছর, গোমস্তাপাড়া, রংপুর। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল রংপুর শহর ত্যাগ করার সময় পুরাতন রেডিও সেন্টারের নিকটে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধৃত হন এবং নিহত হন। ১৪। **আবুল হোসেন (সাজাহান),** গোমস্তাপাড়া, রংপুর, ২৪ জুন ১৯৭১ ক্যান্টনমেন্টের নিকট পাক সেনা কর্তৃক ধৃত এবং পরে রাত্রিতে নিহত হন।

৩নং ওয়ার্ড

১। **মোবারক হোসেন,** পিতাঃ মৃত আঃ কাদের, শালবন, রংপুর। মুক্তিযোদ্ধা মোবারক ২৬ আগষ্ট পাক বাহিনী সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন। ২। **আঃ রাজ্জাক,** পিতাঃ আঃ জব্বার, ২৪ মার্চ রাতে ২নং ট্রাফিকের সামনে পাক হানাদারবাহিনী কর্তৃক নিহত হন। ৩। **আঃ হালিম,** পিতাঃ মৃত আকবার আলী, জুম্মাপাড়া, রংপুর; এবং ৪। **আঃ মান্নান,** পিতাঃ মৃত মতিয়ার রহমান বসুনিয়া, হনুমানতলা, রংপুর। এই দু'জন শহীদের মৃত্যুর তারিখ এবং স্থান আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

৪ নং ওয়ার্ড

১। পাখি মৈত্র, গুপ্তপাড়া, রংপুর। **২। মাজাহার হোসেন,** গুপ্তপাড়া, রংপুর। ইপিআর বাহিনীর নায়েক। ওয়ার্লেস বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাঙালী এবং বাঙালীদের পক্ষে মত পোষণের জন্যে তাকে ৭ এপ্রিল রংপুর ইপিআর ক্যাম্প থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতন করার পর পাক আর্মিরা ১৭ এপ্রিল মাহিগঞ্জের কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে তাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। তাঁর সাথে আরো নিহত ব্যাক্তিদের নাম জানা যায়নি। **৩। মোজাম্মেল হোসেন, ৪। নাসিম (গুপ্তপাড়া),** এরা দু'জন পিতা ও পুত্র। জুন-জুলাই মাসের দিকে গুপ্তপাড়ার বাসা থেকে রংপুর টাউন হলে পাঞ্জাব পুলিশ ক্যাম্পে আটক করে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে মোজাম্মেল হক এবং নাসিমকে হত্যা করা হয়। **৫। শফিকুল ইসলাম,** রংপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর বাড়ি পাটগ্রামে। গুপ্তপাড়ায় থাকতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। রংপুরের অদূরে পাক আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ চালাতে গিয়ে উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় হয়। অসাবধানতার কারণে সাবমেসিন গানের গুলিতে নিহত হন। **৬। আলী মিয়া,** গুপ্তপাড়া। **৭। চাঁন মিয়া,** বিহারীদের নিকট খবর শুনে পাঞ্জাব পুলিশরা জুলাই মাসের দিকে রাত প্রায় ১ টার সময় গুপ্তপাড়াস্থ আলী মিয়ার মুদি দোকানে হামলা চালিয়ে দোকান থেকে আলী মিয়া এবং দোকানের কর্মচারী চাঁন মিয়াকে গ্রেফতার করে এবং টাউন হল ক্যাম্পে তাদেরকে ৭ দিন নির্যাতনের পর হত্যা করে। **৮। সরিফুল আলম (মকবুল),** রংপুরের প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে মিছিল করে ৩ মার্চ সকাল ১০ টার দিকে। সেই মিছিলে রংপুরের সংগ্রামী জনতা অংশ নেয়। আলমনগর ষ্টেশন মোড়ে, বর্তমান দরদী সিনেমা হলের সন্নিকটে ১২ বছরের কিশোর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শঙ্কু উর্দুতে লেখা সাইন বোর্ড নামিয়ে ফেলতে গেলে একজন বিহারী, নেছার মিঞা, তার বাড়ির দোতলার উপর থেকে গুলি চালায়। এই গুলিতে শঙ্কু তৎক্ষণাৎ নিহত হয় এবং শরিফুল আলম (মকবুল) আহত হয়, পরে তাকে রংপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক মাস চিকিৎসার পর এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে শরিফুল মৃত্যুবরণ করে। **৯। শঙ্কু সমজদার,** গুপ্তপাড়া, রংপুর। ৩ মার্চ রংপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকালে এক বিহারী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন। তার মৃত্যুতে গোটা রংপুরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য মিছিল বের হয়। তিনি ছিলেন রংপুরের প্রথম শহীদ।

৫ নং ওয়ার্ড

১। আঃ আজিজ, পীরপুর, আলমনগর। **২। বাসু মিয়া,** আলমনগর, রংপুর। **৩। কুমুদ বন্ধু সরকার,** রবার্টসনগঞ্জ, রংপুর। **৪। জিতেন সরকার,** তাজহাট, রংপুর। **৫। শান্তবাবু,** বাবুপাড়া, আলম নগর। **৬। গোলাম মর্তুজা,** বাবুপাড়া, রিফিউজী কলোনী। **৭। পান্নার ভাই। ৮। হোসেন,** অয়েল মিলের একজন শ্রমিক। **৯। শেখ ফরিদ,** পিতাঃ মৃত আবু তাহের। **১০। নুর মোহাম্মদ,** পিতাঃ মৃত সরুত উল্লা, নূরপুর, রংপুর, ৭ মে ১৯৭১ নিহত হন। **১১। দবির মিঞা,** পিতাঃ মেরাজ উদ্দিন, নূরপুর, রংপুর, ৭ মে ১৯৭১ নিহত হন। **১২। আব্দুছ সালাম,** তিস্তা কলোনী আলমনগর। **১৩। মেহের আলী,** তিস্তা কলোনী, আলমনগর। **১৪। মর্তুজা মিঞা,** সরকারী কর্মচারি, আলমনগর। **১৫। শান্তি চাকী,** বাবুপাড়া। **১৬। জীতেন্দ্রনাথ মালী,** তাজহাট, সরকারী কর্মচারি কালেক্টরেট। **১৭। গেদু মিঁয়া,** পীরপুর, আলমনগর। **১৮। চাঁদ মিঞা,** পীরপুর, আলমনগর। **১৯। জুলু মিঞা,** পীরপুর। **২০। আঃ জলিল মিঞা,** বাবুপাড়া। **২১। আব্বাস আলী,** তাজহাট। **২২। কাশেম মিয়া,** তাজহাট।

'আজকের কাগজ' ১৩-৯-৯৩, ২০-৯-৯৩ এবং ২৭-৯-৯৩ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে একটি পত্র

স্মরণ ও বিস্মরণ

সুধী

মহান মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী '৯৬ উপলক্ষে আগামী ১৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩-০০টা থেকে রংপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহীর মাতা মিসেস মরিয়ম খানম।

অনুষ্ঠানমালাকে সার্থক করে তোলার জন্য আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

মোয়াজ্জেম হোসেন
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটি
রংপুর।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র

রংপুরে প্রজন্ম '৭১- এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রজন্ম'৭১ (একাত্তরের শহীদদের সন্তান), রংপুর-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গত শুক্রবার সকালে স্থানীয় টাউন হলে ৩ গ্রুপে কবিতা আবৃত্তি ও ২ গ্রুপে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধায় টাউন হলে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিচারণ আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শহীদ মুখতার ইলাহী'র মাতা মিসেস মরিয়ম খানম। সংগঠনের সভানেত্রী ইসমত আরা মিঠুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন শহীদ শংকু'র মাতা দিপালী সমজদার, ডঃ রেজাউল হক, আবু জাফর আবদুল্লাহ, মাহাবুব রাশেদ জুয়েল ও সংগঠনের সহ-সভাপতি আনিস রহমান। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবদাস ঘোষ দেবু ও এসএম আরিফুজ্জামান আরিফ। পরে প্রধান অতিথি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

রংপুর ব্যুরো : প্রজন্ম'৭১ থেকে সংকলিত।

জেগে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধারা

৩১ ডিসেম্বর বুধবার, পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠ গর্বিত হলো। তার বুকে স্বাধীনতার ৩২ বছর পর একত্রিত হলো বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। দিনভর রংপুর শহর ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের পদচারণায় মুখরিত। শহরবাসীর মুখে মুখে ছিলো মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশের আলোচনা। রংপুর অঞ্চলের প্রায় ২ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রংপুর শহরের পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে একত্রিত হন। সকাল ১০ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী'র মাতা মরিয়ম ইলাহী।

মহাসমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শহর জুড়ে যেনো আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাপী ওই আনন্দ শোভাযাত্রা যখন শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করছিলো, তখন রংপুর শহর আনন্দের শহরে পরিণত হয়। জাসদসহ বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ লোকেরা ফুল ছিটিয়ে

মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানায়। সে দৃশ্য সকলকে ফিরিয়ে নিয়েছিলো '৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর। যে দিন বাংলার বীর সেনানীর বিজয় বেশে শহরে ঢুকেছিলো। শোভা যাত্রাটি পাবলিক লাইব্রেরী মাঠের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। মুক্তিযোদ্ধা মহা সমাবেশের আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও রংপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সদরুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে এ মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশে রংপুর অঞ্চল বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের স্মৃতিচারণ করেন। এতে বক্তব্য রাখেন, সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল (অব;) মুস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম গণতন্ত্রী পার্টি ও সভাপতি মোঃ আফজাল, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ আব্দুর রাজ্জাক, জাসদ নেতারফিকুল ইসলাম গোলাপ, সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার গোলাম মোস্তফা, আজিজুল ইসলাম বীর প্রতীক, মমতাজ উদ্দিন বীর প্রতীক, অ্যাডভোকেট ইলিয়াস আহম্মেদ, মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, আকবর হোসেন, টিপু মুন্সী, মোজাফফর হোসেন চাঁদ, অপিল আহম্মেদ, আবুল মাসুদ চৌধুরী নান্টু, ফজলুল হক, জয়নাল আবেদীন, জহির উদ্দিন মোঃ জাহাঙ্গীর, শাহাজাদা, রশিদুল ইসলাম, মজিবর রহমন মাস্টার প্রমুখ। বক্তরা বলেন, দেশে আজ এক ক্রান্তিকাল বিরাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি আজ মন্ত্রীর পদ অংলকৃত করছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার পায়তারা চলছে। মুক্তিযোদ্ধদের নানা দৈন্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন মহল অশুভ কাজ সিদ্ধ করার অপচেষ্টা করছে। এই অপশক্তিকে রুখতে তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধদের আবারো একত্রিত হবার আহ্বান জানান।

সমাবেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ১১ দফা প্রস্তাব সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়। মুজিব বাহিনীর এবং অনুষ্ঠানের লিডার মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান প্রস্তাবগুলো পাঠ করেন। ১১ দফার মধ্যে রয়েছেঃ

১) মুক্তিযোদ্ধাদের 'জাতির শেষ্ঠ সন্তান' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।
২) জাতীয় কমিশনে গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
৩) সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক সম্মানীভাতা প্রদান করতে হবে।
৪) শহীদ পরিবার ও মৃত্যুবরণকারী মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য উপযুক্ত ভাতা প্রদান করতে হবে।

৫) মুক্তিযোদ্ধাদের সহজ শর্তে সকল ধরনের ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৬) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সকল কর মওকুফ করতে হবে।

৭) মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

৮) মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ সন্তানদের কোঠা অনুযায়ী চাকুরি নিশ্চিত করাতে হবে।

৯) ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য খাস জমি ও পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ করতে হবে।

১০) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।

১১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি ভোটে গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশের উপজেলা জেলা ও কেন্দ্রে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের নির্ধারণ করতে হবে।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা সমস্বরে ৩১ ডিসেম্বরকে জাতীয় ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে পালন করার দাবি জানায় এবং ১১ দফার সংঙ্গে এই দাবিতে সংযুক্ত কওে ১২ দফা দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব দ্যায়।

অবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার আলোচিত গান গেয়ে শোনান।

এদিকে ৪ জানুযারি রোববার রংপুরের সর্বদলীয় মুক্তিযোদ্ধা ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহত্তম স্বার্থে ১২ দফা দাবিনামা সম্বলিত স্বরকলিপি ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে দাখিল করা হয়। এ সময় সর্বদলীয় মুক্তিযোদ্ধ ঐক্যজোটের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ইলিয়াস আহমেদ, মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, আকবর হোসেন, সদরুল আলম দুলু, মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু, মোঃ জাহাঙ্গীর, আবুল মাসুদ চৌধুরীন নান্টু, মোঃ ফজলুল হক ও আব্দুল হাফিজ খান লোপচু উপস্থিত ছিলেন।

অটল, ৫ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে সংকলিত।

রংপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ

দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের খুন, হত্যার প্রতিবাদে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণাসহ ৮ দফা দাবিতে বুধবার স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী'র মাতা মরিয়ম ইলাহী জাতীয় ও দলীয় পতাকা তুলে সমাবেশের উদ্বোধন করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। উদ্বোধন শেষে একটি র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণের সময় রাস্তার দু'ধারে সমবেত মানুষগন করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানায়। এ সময় র‍্যালিটি জাসদ দলীয় কার্যালয়ের সামনে পৌঁছলে জাসদ নেতাকর্মীরা তাদের স্বাগত জানিয়ে পুষ্পবর্ষণ করে। দলমত নির্বিশেষে বৃহত্তর রংপুরের কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট জেলা ও উপজেলার মুক্তিফৌজ, মুজিব বাহিনী, শহীদ পরিবারের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধে সহযোগী সহস্রাধিক যোদ্ধা এ সমাবেশে যোগদান করেন।

রংপুর : মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল র‍্যালি

দিনভর চলে মুক্তিযোদ্ধের স্মৃতিচারণ, মধ্যাহ্নভোজ ও আলোচনা সভা। সমাবেশের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রংপুর প্রেসক্লাব সভাপতি সদরুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম, মমতাজ

উদ্দিন বীর প্রতীক, হারেছ উদ্দিন সরকার বীর প্রতীক, আজিজুল ইসলাম বীর প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজ, ইলিয়াস আহমেদ, মোঃ আফজাল, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, ডা. হামিদুল হক খন্দকার, টিপু মুন্সি, আবদুল মাসুদ চৌধুরী নান্টু, অপিল উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে একটি মহলের পরিকল্পিত চক্রান্তে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ, তিতীক্ষা, আশা-আকাঙ্খা সবকিছু লুণ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মহলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনকণ্ঠ, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে সংকলিত।

মরিয়ম ইলাহী

রংপুরের সমাজসেবিকা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুখতার ইলাহী'র মা মরিয়ম ইলাহী (৯৫) বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় রংপুরের ধাপে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী রাজিউন)। তিনি সাত ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রেখে গেছেন। গতকাল বিকেলে জানাজা শেষে মুন্সিপাড়া কবরস্থানে তার লাশের দাফন সম্পন্ন হয়।

প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

রংপুরে শহীদ জননী মরিয়ম ইলাহী'র ইন্তেকাল

রংপুরে শহীদ জননী মরিয়ম ইলাহী বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় বার্ধক্য জনিত কারণে তাঁর নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ...... রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি শহীদ খোন্দকার মুখতার ইলাহী ও রংপুর কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ঠ সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার মারুফ ইলাহী'র মাতা। তিনি ৭ ছেলে-

মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। এদিকে গতকাল বাদ আছর রংপুর কেরামতিয়া মসজিদে শহীদ জননীর জানাযা শেষে স্থানীয় মুন্সিপাড়া কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

শহীদ জননী মরিয়ম ইলাহী'র মৃত্যুতে রংপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সদরুল আলম দুলু, সাধারণ সম্পাদক রশীদ বাবু, রংপুর চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবুসহ সকল কর্মকর্তা শোক প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

যুগের আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

শহীদ মুখতার ইলাহী'র মাতার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক

শহীদ মুখতার ইলাহী'র মাতা মরিয়ম ইলাহীর মৃত্যুতে তাঁর নিজ বাসভবনে আজ এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকলকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মরিয়ম ইলাহী'র মৃত্যুতে যারা শোক প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন মাহিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি বাবলু নাগ ও সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন সুমন দুলাল। এক শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ কেমিষ্ঠ এ্যান্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদের। তিনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আরো শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি রংপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পদক মোঃ আবু সামছুজ্জামান ও প্রচার সম্পাদক মোঃ ওবায়দুল মজিদ। এক শোক বার্তায় তাঁরা বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে আরো যারা শোক প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন রংপুর চেম্বার জুনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নিলু সরকার ও বিশিষ্ট ঠিকাদার ফজলুল হক।

অটল (সাপ্তাহিক), সেপ্টেম্বর ২০০৪।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শহীদ মুখতার ইলাহী' হল উদ্বোধন

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য নির্মিত 'শহীদ মুখতার ইলাহী' হলের উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী ২৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ বুধবার বেলা ১১টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে হলটি উদ্বোধন করেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর-এ শহীদ মুখতার ইলাহী হল উদ্বোধন করেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী

হলের প্রোভস্ট মো: আমির শরীফের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান, কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাইদুল হক, শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হলের প্রোভস্ট ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান (তুহিন ওয়াদুদ), প্রফেসর মো. কাহিনুর রহমান ও শহীদ মুখতার ইলাহী'র ছোট ভাই কে. মাহফুজ ইলাহী। এর আগে উপাচার্য জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে উপাচার্য শিক্ষর্থীদের উদ্দ্যেশে বলেন, শহীদ মুখতার ইলাহী দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, তোমাদেরকে এই হলের আবাসিকতার মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ তথা দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সেজন্য শিক্ষা জীবনেই নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দফতর সূত্রে জানা যায়, ৫ জুলাই ২০১১ সালে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মু. আ. জলিল হলটির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে হলটির নাম 'শহীদ মুখতার ইলাহী হল' চূড়ান্ত করা হয়। ছাত্রদের আবাসনের জন্য ৬ কোটি ৫৩ লাখ ব্যয়ে ৬ তলা বিশিষ্ট এই হলে ৭০টি কক্ষ রয়েছে। প্রায় সাড়ে তিনশত ছাত্রকে আবাসিক সুবিধা দেওয়া হবে।

লালন চন্দ্র সিংহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ প্রতিনিধি, 'বাংলাদেশ সময়' (অনলাইন) এবং ওমর ফারুক, বেরোবি প্রতিনিধিদের তথ্য থেকে সংগৃহিত।

সুধী,

রংপুর উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২২ মে, ২০১৬, রবিবার বিকেল ৩.০০মি. রংপুর টাউন হলে রংপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কারমাইকেল কলেজের শতবার্ষিকী (১৯১৬-২০১৬) উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে **"বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও কারমাইকেল কলেজ"** শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কারমাইকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **ড. মুহম্মদ রেজাউল হক**। কারমাইকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ **অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক মোঃ নুরুন্নবী চৌধুরী ও অধ্যাপক খায়রুল আলম ডাকুয়া** এবং বর্তমান **অধ্যক্ষ বিনতে হুসাইন নাসরিন বানু** বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

অনুষ্ঠানে আপনার সহৃদয় উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

চৌধুরী খালেকুজ্জামান	**শামসুল ইসলাম পিচু**
আহ্বায়ক	সদস্য-সচিব

রংপুর উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ

অনুষ্ঠানসূচী

১ম পর্ব -

'বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও কারমাইকেল কলেজ' শীর্ষক আলোচনা সভা

আলোচকবৃন্দ :

- **কালিরঞ্জন বর্মন**
  অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- **জনাব নজরুল ইসলাম হাক্কানী**
  অধ্যক্ষ, ইটাকুমারী শিবচন্দ্র রায় কলেজ, পীরগাছা, রংপুর
- **শাহ্ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম**
  অধ্যক্ষ, বড়ুয়াহাট বিএম কলেজ, কাউনিয়া, রংপুর
- **মোঃ মতিয়ার রহমান**
  সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

২য় পর্ব - মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা

সম্মাননা প্রদান :

- বীর মুক্তিযোদ্ধা, কারমাইকেল কলেজের সাবেক ভিপি **শহীদ মুখতার ইলাহি**
- বীর মুক্তিযোদ্ধা **শহীদ গোলাম গউস**
- মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা **শাহ্ আব্দুর রাজ্জাক** (সাবেক এমপিএ)
- বীর মুক্তিযোদ্ধা **মাহবুব আলম**
- বীর মুক্তিযোদ্ধা **শহীদুল ইসলাম বাবলু**

বিশেষ অতিথিবৃন্দের ভাষণ

প্রধান অতিথির ভাষণ : **অধ্যাপক ড. মুহম্মদ রেজাউল হক**

সভাপতির ভাষণ : **চৌধুরী খালেকুজ্জামান**
আহ্বায়ক, রংপুর উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ
[সাবেক সদস্য, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ]

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : **মোঃ গোলাম মোস্তফা**
যুগ্ম আহ্বায়ক, রংপুর উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ
[ডেপুটি কমান্ডার, রংপুর জেলা ইউনিট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ]

রংপুর উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ কর্তৃক শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই-
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে কারমাইকেল কলেজ পরিবারের যে সকল
শিক্ষক ও ছাত্র শহীদ হয়েছেন তাঁদের নামের সারণি

শিক্ষক

শহীদ অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান, উর্দু বিভাগ।
শহীদ অধ্যাপক কালাচাঁদ রায়, রসায়ন বিভাগ।
শহীদ অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায়, গণিত বিভাগ।
শহীদ অধ্যাপক সুনীলবরণ চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ।
শহীদ অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, বাংলা বিভাগ।
শহীদ অধ্যাপক আব্দুর রহমান, রসায়ন বিভাগ।

ছাত্র

শহীদ কে মুখতার এলাহী (চিনু)
ভি পি- ১৯৭০-৭১, কারমাইকেল কলেজ ছাত্র সংসদ।
শহীদ গোলাম গৌওছ (নওশা)।
শহীদ শফিকুল আলম (মকবুল)।

স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি

বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হোক

২৫ আগষ্ট তারিখে জনকণ্ঠে প্রকাশিত উপরোক্ত বিষয়ে খবরের সূত্রানুসারে এই পত্র। সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এই আটটি মাত্র স্মৃতিসৌধ নির্মাণ হবে কেন? দেশের প্রায় সকল তৎকালীন পাকি ক্যান্টনমেন্টসমৃদ্ধ জেলায় বধ্যভূমির অবস্থান রয়েছে। এ সম্পর্কে এ যাবত বিভিন্ন পুস্তকে ব্যাপক তথ্যও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি উত্তর বাংলাদেশের দু'টি বধ্যভূমির উল্লেখ করতে চাই। এর একটি হলো (ক) সৈয়দপুর শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি বধ্যভূমি যেখানে পাকি ও দোসর বাহিনী যুদ্ধকালীন পর্যায়ক্রমে কয়েক হাজার বাঙালীকে হত্যা করেছে। বর্তমানে তার ওপর দিয়ে পরিকল্পিতভাবে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণ হয়েছে। বাইপাসটির নির্দিষ্ট স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা উচিত; এবং (খ) লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ি থানার আইর খামার গ্রামে পাকি বাহিনীর দোসরদের আমন্ত্রণে পাকি বাহিনী একটি মুক্তিযোদ্ধা দলের ওপর ৯ নভেম্বর ভোরে এ্যামবুশ আক্রমণ চালায়। স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে মুক্তিবাাহিনীর প্রায় সকল যোদ্ধা শহীদ হন এবং পাকি আক্রমণের ফলে ১১৯ গ্রামবাসী (মতান্তরে ১২৬ জন) আইর খামার ডাকবাংলো প্রাইমারী স্কুলের মাঠে গণহত্যার শিকার হয়। ঐ গ্রামে পাকিদের দ্বারা ধর্ষণ ঘটনাও ঘটে। প্রাইমারী স্কুলটি এখনও আছে, ডাকবাংলো এখন নেই, কিন্তু ডাকবাংলোর ভূমিটি এখন সরকারী খাস জমি।

উক্ত দু'টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য আমি সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। এতে শহীদের যেমন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হবে, তেমনি নতুন প্রজন্ম এদের অবদান স্মরণ করবে।

ডঃ কে মউদুদ ইলাহী, প্রফেসর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
জনকণ্ঠ ৩১-৮-৯৯।

লালমনিরহাটে ১১৯ জনকে খুঁচিয়ে হত্যার নায়ক হাসান শাহীদ মঞ্জু এখন জাতীয় পার্টি নেতা

৭১-এর ৯ নভেম্বর বড়বাড়ী ডাকবাংলোর মাঠে ১১৯ জনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যার নায়ক পাকি সেনাদের দোসর রাজাকারের ক্যাপ্টেন হাসান শাহীদ মঞ্জু এখন লালমনিরহাট জেলা জাতীয় পার্টির (মিজান-মঞ্জু) আহ্বায়ক। পেশায় একজন এ্যাডভোকেট। ১৯৭১ সালে

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় হাসান শাহীদ মঞ্জু রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিল। সে ছিল ওই অঞ্চলের রাজাকারদের প্লাটুন কমান্ডার। তাকে পাকি সেনারা ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্ক প্রদান করেছিল। সে খাকি পোশাকে কাঁধে ৩টি স্টার লাগিয়ে গাড়ি নিয়ে দাপটের সঙ্গে চলাফেরা করত। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক ব্যক্তি বলেন, তার দায়িত্ব ছিল রাজাকার ও আলবদর বাহিনী সংগঠিত করা। সে জেলা সদরে অবস্থিত রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুলে পাকি ক্যাম্পে রাজাকারদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত।

১৯৭১ সালে রাজাকার হাসান শাহীদ মঞ্জু ছিল আতঙ্কিত একটি নাম। সে সময় এই রাজাকার কমান্ডার মঞ্জু ক্যাপ্টেন নামেই ছিল পরিচিত।

১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর জেলা সদরের বড়বড়ী ইউনিয়নের ডাকবাংলো মাঠে ১১৯ জনকে এ্যাডভোকেট হাসান শহীদের নেতৃত্বে হত্যা করে রাজাকার ও পাকি সেনারা। তাদের পাখির মতো ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল। সেই হত্যাকান্ডের সাক্ষী তৎকালীন সময়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র বর্তমানে লালমনিরহাট মোটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাবুল হাবিব লাভলু জনকণ্ঠের এ প্রতিনিধিকে জানান, সেদিন ছিল ৯ নভেম্বর' ৭১। পাকি সেনারা স্থানীয় লোকজেনের সঙ্গে আমাকে ও আমার পিতা আবুল কাসেমকে ধরে নিয়ে যায় বড়বাড়ী ডাকবাংলো মাঠে। গিয়ে দেখি, ইতোমধ্যে প্রায় শতাধিক লোককে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের ডাকবাংলোর মাঠে সরিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যারা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমি এ্যাডভোকেট হাসান শাহীদ মঞ্জুকে চিনতাম। আমি তার কাছে আমার পিতার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমার চোখের সামনেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল আমার পিতাকে। আমার পিতা ছিলেন পাঙ্গারানী লক্ষ্মী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তা ছাড়া তিনি ছিলেন বড়বাড়ী ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি মুক্তিযোদ্ধদের খেতে দিয়েছিলেন। আমার বাবাকে হত্যার পর এই রাজাকারের কমান্ডার হাসান শাহীদ মঞ্জু কুড়িগ্রামের রাজাকার ক্যাম্পে আমাকে আটক রেখেছিল। সেদিন আমার বাবার সঙ্গে রাজাকার হাসান শাহীদ মঞ্জু পাকি সেনারা ঐ ডাকবাংলোর মাঠে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা ১১৯ জনকেও হত্যা করেছিল।

এঁদের মধ্যে তৎকালীন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি মুখতার ইলাহীও ছিলেন। ডাকবাংলার মাঠে শহীদ মুখতার ইলাহীসহ গণহত্যার শিকার সকলের গণ কবর রয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর শহীদ আবুল কাসেমের পুত্র আসাবুল হাবিব লাভলু তাঁর

পিতাকে হত্যা করার দায়ে রাজাকার কমান্ডার হাসান শাহীদ মঞ্জুর বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেছিলেন। সেই মামলয়ি ১১৯ গণহত্যার নেতৃত্বেও হাসান শাহীদ মঞ্জুর নাম রয়েছে। সে ছিল প্রধান আসামী। কিন্তু হত্যার বিচার হয়নি।

সে এখন জেলা শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। রাজাকারের কমান্ডার হাসান শাহীদ মঞ্জুর সমাজসেবী হিসাবেও পরিচিতি রয়েছে।

হাসান শাহীদ মঞ্জুর বক্তব্য

'আমি ১৯৭১ সালে কোন বিতর্কিত ভূমিকা পালন করিনি। লালমনিরহাট জেলা সদরের বড়বাড়ী ইউনিয়নে ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর পাকবাহিনী যে হত্যাকান্ড চালিয়েছে তার সঙ্গে আমি জড়িত নই। আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর কালীগঞ্জ থানার মোহালী গ্রামে তৎকালীন সিও ডেপঃ মোহাম্মদ আলী সাহেবের বাড়িতে আমার বাবা-মার খোঁজ করতে গিয়ে পাকি সেনাদের হাতে ধরা পড়ি। সেদিন থেকে আমাকে ভোটমারী রেলওয়ে স্টেশনে মালগাড়িতে বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। আমাকে ধরিয়ে দেয়ার পিছনে কুখ্যাত রাজাকার হোসেন আলী মাওলানা ও প্রয়াত রাজাকার মন্টু গাজীর হাত ছিল।'

প্রত্যক্ষদর্শী আসাবুল হাবিব লাভলুর বক্তব্য

'আমি নিজে সেদিন (৯ নভেম্বর)'৭১ সালে দেখেছি। বড়বাড়ী ডাকবাংলো মাঠে রাজাকারের কমান্ডার হাসান শাহীদ মঞ্জু আমার বাবা শহীদ আবুল কাসেম, তৎকালীন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভিপি মুখতার ইলাহীসহ নিরীহ ১১৯ গ্রামবাসীকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে আসাবুল হাবিব বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছিল, যার নং লাল-থানা-কেচ নং ১৯, তাং ২১/০৩/১৯৭২, ইউএস ১৪৯/৩০২/৩৮০ বিপিসি । এ হত্যা মামলার প্রধান আসামী ছিল রাজাকার হাসান শাহীদ মঞ্জু। লাভলু আরও জানান সেদিন এই মঞ্জু আমাকে কুড়িগ্রামে রাজাকার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

জনকণ্ঠ। ৩-৪-২০০১।

লালমনিরহাটের 'সেই রাজাকার'এবং বড়বাড়ী বধ্যভূমি

লালমনিরহাটের ৯ নভেম্বর'৭১-এ ঘটনা এবং এর কুশীলবদের প্রায় ৩০ বছর পর জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য 'জনকণ্ঠ' কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই । এ ঘটনায় বড়বাড়ীর নিরীহ শতাধিক গ্রামবাসী ও মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের ওপর গণহত্যা চলেছিল। অন্যদের সাথে আমার ছোট ভাই, মুখতার ইলাহীকে পাকিবাহিনী বেয়োনেট চার্জ করে নৃশংসভাবে এখানে হত্যা করে। ঘটনার সময় সেই রাজাকার সশরীর উপস্থিত ছিল-প্রমাণ আছে।

১৯৭০-৭১-এ মুখতার ইলাহী কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি ছিল (জিএস নয়) ইতোপূর্বে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট অভিযানে তার উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ভূমিকা ছিল। ৯ নভেম্বর তারিখে তার নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল তিস্তা এলাকায় অপারেশনের উদ্দেশ্যে বড়বাড়ী ইউনিয়নের আইর খামার গ্রামে রাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দোসর রাজাকার কমান্ডারের আমন্ত্রণে পাকিবাহিনী এদের ওপর ভোররাতে এ্যামবুশ করে আক্রমণ চালায়। স্বল্পস্থায়ী এক অসম যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রায় সকল সদস্য ধরা পড়ে ও কয়েকজন শহীদ হয়। পাকিরা শতাধিক গ্রামবাসীকে ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে জড়ো করে। এই সময় গ্রামে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে। সকালে গণহত্যাকর্ম সমাধা হয়। পরে গ্রামবাসীরাই আমার ভাইসহ অন্যদের ধর্মীয় মর্যাদায় যথাযথ দাফন করেন। হ্যাঁ, একদিক দিয়ে রাজাকার হাসান শাহীদ সত্য কথা বলেছে। ৯ নভেম্বর সে গণহত্যায় অংশগ্রহণের পর ২৭ নভেম্বর কেন, তারপরও পাকিদের সাথে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে ভোটমারী-কালিগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করেছিল।

২৫-০৮-৯৯ তারিখে সরকার আটটি চিহ্নিত বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা দেয়। ৩১-০৮-৯৯ তারিখে আমি আইর খামারস্থ বড়বাড়ী ডাকবাংলো অঙ্গনে (এবং সৈয়দপুর বাইপাস সংলগ্ন বধ্যভূমিতে) শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আবেদন জানাই। লক্ষণীয় যে, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্মৃতি মুছে যাচ্ছে। আমার ভাইয়ের স্মরণে রংপুরের প্রধান সড়কের নামকরণ হয়েছিল 'শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী'। ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর সে নাম আর নেই। এভাবে বহু মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি ১৯৭৫-এর পর পরিকল্পিতভাবে অপসারণ করা হয়েছে।

বড়বাড়ী ডাকবাংলোটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। এখনে এখন একটি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এরই পাশে বধ্যভূমিটি। এটি খাস জমি। এখানে প্রতিবছর ৯ নভেম্বর গ্রামবাসীরা নিজস্ব স্মরণ অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করে থাকে। এখানকার শহীদদের অনেকে তালিকাভুক্ত নয় বা সনদপ্রাপ্তও নয়। এদের এসবের প্রয়োজনও নেই। তালিকাভুক্তি বা সনদপত্রের জন্য '৭১-এ কেউ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেছেন। আমরা কি আমাদেও কর্তব্য পালন করছি? সরকারী উদ্যোগে এখানে কি একটি স্মৃতিসৌধ না হোক একটি স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করা যায় না? সরকারী পর্যায়ে এখানে কিছু করা সম্ভব না হলে উপরোক্ত খাস জমিটুকু 'শহীদ মুখতার ইলাহী স্মৃতি ট্রাস্ট'-এর দায়িত্বে দেয়া হোক। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যমতো শহীদানদের স্মৃতি এই গ্রামবাসীদের সহায়তায় রক্ষা করব।

ড. কে মউদুদ ইলাহী, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
জনকন্ঠ। ৬-৪-০১।

হায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা! আর তোমার স্মৃতি ফলক!

রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র পায়রা চত্বর নামক স্থানে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ অগ্রনী ও কৃতি সন্তানদের স্মরণে একটি স্মৃতিফলক রয়েছে। এতে মূল্যবান টেরাকোটা কর্ম রয়েছে যা দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর একাধিক পোস্টার এই স্মৃতি ফলকের বিভিন্ন স্থানে লগিয়ে যেমন মূল্যবান টেরাকোটা কর্ম ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তেমনি শহীদদের চরম অবমাননা করেছে। আর এই কর্মটি হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের দাবিদার একটি রাজনৈতিক দলের তথাকথিত উৎসর্গকৃত সৈনিকদের দ্বারা।

ইতোমধ্যে দেশে বিজয় দিবস এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলন রংপুর শহরে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে গত প্রায় তিনমাস যাবৎ পোস্টারগুলো বিবর্ণ প্রায় হয়ে গেলেও স্মৃতি ফলকে কলংক লেপনের প্রমাণ হিসেবে লেপটে আছে। স্মৃতি ফলকটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যারা আছেন (রংপুর পৌরসভা) তাঁরা এর পবিত্রতা ও সৌকর্য সংরক্ষণে চরম ঔদাসিন্য দেখিয়েছে।

অপরদিকে, বিশ্বাস করতে হবে কি যে, উপরিউক্ত প্রধান রাজনৈতিক দলটিতে রাজাকার সন্তানরা ক্রমবর্ধমান হারে অনুপ্রবেশ করে দলটির মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চেতনা ও গৌরববোধকে এহেন কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে? দলটির নেতৃবৃন্দ এধরনের আগাছা এখনই নির্মূল করুন - এতে আপনারা স্বধীনতামনস্ক রংপুরবাসীর আস্থাভাজন হবেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতামনস্ক রংপুরবাসীর নিকট অনুরোধ - স্মৃতিফলকটিকে এখনই কলংকমুক্ত করার ব্যবস্থা করুন।

ড. কে. মউদুদ ইলাহী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। অটল, ১-৩-২০০৪।

স্মৃতিসৌধে জিয়ার পাশাপাশি খলেদা জিয়া ও দুলুর ছবি

লালমনিরহাটে বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

লালমনিরহাট সদর উপজেলায় সদ্যনির্মিত বড়বাড়ী শহীদ স্মৃতিসৌধে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বেগম খলেদা জিয়া এবং স্থানীয় সাংসদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে নিয়ে আঁকা রঙিন চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহলে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

জেলা আওয়মী লীগ, জাসদ (ইনু), জাতীয় পার্টি, বাসদ, সিপিবির নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযোদ্ধারা পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি স্মৃতিসৌধের নগ্ন দলীয়করণ। তবে উপমন্ত্রী দুলু বলেছেন, এ উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লঙ্ঘিত হয়নি বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কাউকে সৌধে স্থান দেওয়া হয়নি।

বড়বাড়ীর আইর খামার ডাকবাংলো মাঠে ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর রাজাকার ও পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন ১১৯ জন বাঙালি। তাদের স্মরণে স্থানীয় আর কে রোডের সাদেকনগর ত্রিমোহনীতে স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়। যে শহীদদের স্মরণে ২০ শতক জমির ওপর স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন উপমন্ত্রী দুলুর বাবা স্থানীয় পাংগারানী লক্ষ্মী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বড়বাড়ী ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান শহীদ আবুল কাশেম, রংপুর কারমাইকেল কলেজের তৎকলীন ছাত্র সংসদের ভিপি মুখতার ইলাহী প্রমুখ।
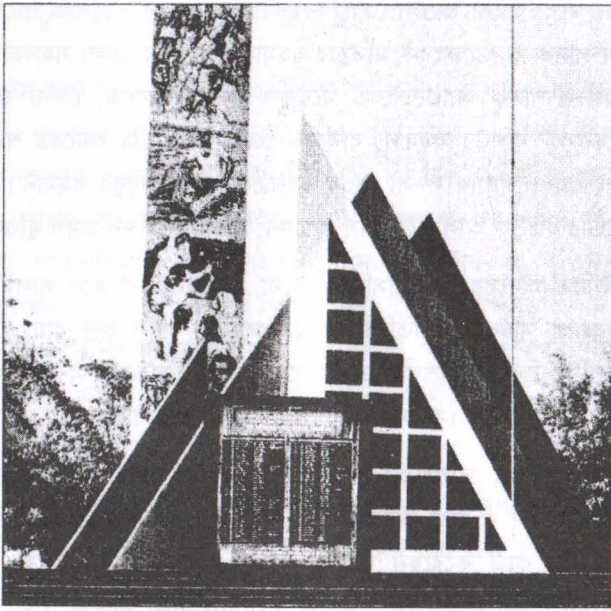
লালমনিরহাটে বড়বাড়ি শহীদ স্মৃতিসৌধের বেদির পেছনে ৩৮ ফুট উঁচু স্তম্ভে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে নিয়ে আঁকা রঙিন টাইলস পেইনটিং

জানা যায়, প্রকল্পটি ২০০৩ সালের ১৫ নভেম্বর স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন পায়। এর ব্যয় প্রথমে ১৫ লাখ টাকা ধরা হলেও পুনর্মূল্যায়ন করে ব্যয় ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৪১৩ টাকা ধার্য হয়। গত মাসের গোড়ার দিকে স্মৃতিসৌধে প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হলে ১১৯ শহীদের মধ্যে নাম-পরিচয়সহ ৮৩ জনের একটি নামফলক স্থাপন করা হয়। তবে সৌধের মূল বেদি থেকে সোজা উঠে যাওয়া ৩৮ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও উপমন্ত্রী দুলুকে নিয়ে আঁকা চিত্রকর্ম স্থান পায়।

লালমনিরহাট জেলা আওয়মী লীগের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আবুল হোসেন লিখত বিবৃতিতে বলেছেন, স্মৃতিসৌধের দলীয়করণের জবাব একদিন জনতার আদালতে দিতে হবে। জেলার একমাত্র বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন (অবঃ) আজিজুল হক বলেছেন, স্মৃতিসৌধে জীবিত কোনো মানুষের ছবি থাকাই ঠিক নয়।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আরো আছেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান, সিপিবির জেলা সহসভাপতি ও জেলা বারের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ময়েজুল ইসলাম ময়েজ, জেলা জাসদের (ইনু) সদস্য অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান, বাসদের জেলা আহ্বায়ক কমরেড শওকত হোসেন আহম্মেদ এবং জেলা জাপার সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কমান্ডার ইউসুফ আলী, ইলিয়াস হোসেন, মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা।

স্মৃতিসৌধে জীবিত মানুষের ছবি প্রাসঙ্গিক কি না, জিজ্ঞেস করা হলে লালমনিরহাট জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সচিব ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বাবুল চন্দ্র রায় প্রথম আলোকে বলেন, তার দায়িত্ব ছিল প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে সঠিক ডিজাইন ও কাজের গুণগত মানের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ রাখা। ছবির বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, অনুমোদনকৃত ডিজাইন ও থিম অনুযায়ী স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক জিএস এবং চারুকলার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঢাকা ক্লাসিক আইএর স্বত্বাধিকারী রুস্তম আলী প্রামাণিক।

ডিজাইনার রুস্তম আলী প্রামণিক বলেন, ৩৮ ফুট উচ্চতার এ স্মৃতিসৌধের স্তম্ভে টাইলস পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকেই মূর্ত করা হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান, মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীতে দেশ গঠন ও কৃষি বিপ্লবে শহীদ জিয়ার অবদান বুঝাতে তার দুটি ছবি, নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ বুঝাতে বাংলা বর্ণমালা, শিক্ষাদানরত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি ছবি এবং নিরক্ষরমুক্ত প্রথম জেলা লালমনিরহাট বোঝাতে এর রূপকার উপমন্ত্রী দুলুর ছবি স্তম্ভে রাখা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্মৃতিসৌধের নকশা উপমন্ত্রী দুলুর অনুমোদন ও আগ্রহে চূড়ান্ত হয়।

একাধিক সূত্রমতে, গত ৭ অথবা ৯ নভেম্বর সৌধটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী চলতি কিংবা আগামী মাসে তিস্তা নদীর ওপর সড়ক-সেতু নির্মাণ উদ্বোধন উপলক্ষে লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম সফরে এলে স্মৃতিসৌধটিও উদ্বোধন করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

প্রথম আলো। ৮-১২-২০০৪। আব্দুর রব সুজন-এর প্রতিবেদন।

বড়বাড়ী স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিফলিত হয়নি

৮ ডিসেম্বর প্রথম আলোর ১৬শ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'স্মৃতিসৌধ' শীষক সংবাদেও সূত্রে আমার এই অভিমত। বড়বাড়ী গণহত্যার শিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কারমাইকেল কলেজের তৎকালীন সহসভাপতি শহীদ মুখতার ইলাহীর ভাই হিসেবে এ বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পারছি না। বর্তমান সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের স্মরণে এবং বিভিন্ন জেলায় পাকবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা স্থানে স্মতিসৌধ বা স্মৃতিফলক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ধন্যবাদার্হ হয়েছে সন্দেহ নেই। কেননা স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রায় ৩০-৩২ বছর পর এটাই এ ধরনের প্রথম উদ্যোগ। কিন্তু একটি স্মৃতিসৌধ কখন নির্মাণ হয়? আর তা কাদের উদ্দেশে? এখনে তা বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই। কেননা তা সরকারি সিদ্ধান্তে নিশ্চয় উল্লেখ রয়েছে।

তবে সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কীয় যে কেউ স্বীকার করবেন   এরূপ স্মারকস্তম্ভে ম্যুরাল বা চিত্রকর্মে (যদি থাকে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র এবং শহীদদের অবদানমূলক প্রতিফলন ঘটবে। অপরদিকে একটি স্মৃতিসৌধ/ফলক প্রয়োজন হয় শহীদানদের এরূপ অবদানের আদর্শ সিম্বলিজমের মাধ্যমে যেন নতুন প্রজন্ম স্মরণ করে এবং দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয় ও দেশের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়। আর সে জন্যই যারা আমাদের জন্য একটি দেশ, জাতি-পরিচয় ও পতাকা উপহার দিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সশ্রদ্ধ সম্মান জনানোর জন্যই এরূপ স্মারক নির্মাণের প্রয়োজন। জীবিতদের উদ্দেশে বা লক্ষ্য করে কখনো এরূপ নির্মাণ কাজের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের কোথাও এমন নজির আছে বলে আমার জানা নেই। জীবিত এখন যারা তাদের জন্য এমন স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন তাদের অবদান ও কৃতকর্ম বিচার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মই নির্ধারণ করবে। এখন নয় কোনো যুক্তিতেই।

এখন দেখা যাক বড়বাড়ীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণে কী ব্যত্যয় ঘটেছেঃ

ক. স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ হয়েছে প্রকৃত গণহত্যা স্থান থেকে বেশ দূরে রাস্তার পাশে। যদিও বড়বাড়িতে আইর খামার নামক স্থানে তৎকালীন ডাকবাংলো অঙ্গনটি রাস্তার পাশে ছিল এবং যথেষ্ট উন্মুক্ত খাসজমি ছিল।

খ.স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদানদের ভূমিকা বা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিক্রম প্রতিফলিত হয়নি (এ ধরনের প্রতিফলনই স্বাভাবিক যেমন দেখা গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জাদুঘরে বা রংপুর শহরের প্রবেশ মুখে)। ফলে শহীদানদের কথা বলা হলেও তাদের ভূমিকা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় বলে থাকেন (এবং আমরাও বিশ্বাস করি) যে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।' আলোচ্য স্মৃতিসৌধ ম্যুরালে 'দেশের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়' দেখানো হয়েছে। এতে হয়তো এ এলাকার একটি বিশেষ দল, সংশ্লিষ্ট নেতা বা সদস্যদের ভবিষ্যৎ বিকাশ ঘটবে কিন্তু শহীদ পরিবারদের কোনো মানসিক সান্ত্বনা লাভ বা গর্ব করার কিছুই থাকবে না। বরঞ্চ শহীদানদের একটি দলের ম্যুরালভূক্ত করার ফলে এর রূপকাররা ধিক্কারের বস্তু হবেন কি না তা সময়ই বলে দেবে।

ঘ. তবে যারা এর রূপকার তাদের একটা কারণে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না এ জন্য যে, এই স্মৃতিসৌধের সুযোগ্য মূল্যায়ন হবে হয়তো কয়েক দশক পর। আবার অবমূল্যায়নও হতে পারে যখন কেউ কেউ দেশীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতায় দলত্যাগ করে অন্য দলে আশ্রয় নেবেন - নীতিভ্রষ্টতা বা জীবিকার জন্য।

ঙ. অপর একটি কারণে এর রূপকারদের আবারও ধন্যবাদ যে, সৌধফলকের নিচে শহীদানদের নামতালিকা মর্মর ফলকে নয় - প্লাস্টিক ফলকে উৎকীর্ণ (বিষয়টি ইচ্ছাকৃতও হতে পারে)। কাজেই ডিসেম্বর মাস গত হলে অচিরে এটির বিলুপ্তি ঘটবে। তখন অনেকে দায়িত্ববোধ এবং মর্মজ্বালা থেকে মুক্তি পাবে।

প্রথম আলো। ১৫-১২-২০০৪। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কে. মউদুদ ইলাহী'র অভিমত।

বড়বাড়ী স্মৃতিসৌধে 'জীবিত অমর' খালেদা ও দুলু

লালমনিরহাট সদর উপজেলার বড়বড়ীতে শহীদ স্মৃতিসৌধের ম্যুরালে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবির নিচেই আছে বিএনপি চেয়ারপারসন খলেদা জিয়া এবং সেখানকার সাবেক সাংসদ আসাদুল হাবীব দুলুকে নিয়ে করা ম্যুরালটি। ২০০৪ সালে বিএনপি যখন সরকারে তখন ওই সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপমন্ত্রী আসাদুল হাবীব দুলুর

লালমনিরহাটের বড়বাড়ি স্মৃতিসৌধে এখনও আছে খালেদা জিয়া ও আসাদুল হাবীব দুলুর ছবি

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালমনিরহাট জেলা পরিষদের উদ্যোগে বড়বাড়ীতে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সেই থেকে 'জীবিত অমর' খালেদা ও দুলুর ছবিসংবলিত স্মৃতিসৌধটি নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। নির্মাণের সময় স্মৃতিসৌধ থেকে জীবিত নেতা-নেত্রীর ছবি অপসারণের দাবিতে মুখর লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগ এখন নিশ্চুপ। শুধু তা-ই নয়, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও লালমনিরহাট জেলা পরিষদের প্রশাসক মতিয়ার রহমান স্পষ্টই বললেন, 'বড়বাড়ীর ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যে ওখানে কিছু করতে গেলে রক্তক্ষয় হবে'।

নির্মাণ শেষ হওয়ার পর এক দশকের বেশি সময় কেটে গেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়নি স্মৃতিসৌধটি। লালমনিরহাট জেলা পরিষদ সূত্রে জানা যায়, স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য নেওয়া প্রকল্পটি ২০০৩ সালের ১৫ নভেম্বর স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন পায়। এর ব্যয় প্রথমে ১৫ লাখ টাকা ধরা হলেও পুর্নমূল্যায়ন করে ব্যয় ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৪১৩ টাকা ধার্য করা হয়। ২০০৪ সালের নভেম্বরের দিকে স্মৃতিসৌধের প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হলে ১১৯ শহীদের মধ্যে ৮৩ জনের নাম-পরিচয়সহ এাটি ফলক স্থপন করা হয়, যে ফলকের অস্তিত্ব এখন আর নেই। তবে সৌধের মূল বেদি থেকে সোজা উঠে যাওয়া ৩৮ ফুট উঁচু এটি স্তম্ভে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবীব দুলুকে নিয়ে করা ম্যুরালটি এখনও আগের মতোই রয়ে গেছে।

বড়বাড়ী আইর খামার ডাকবাংলো মাঠে ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন ১১৯ বাঙালি। তাদের স্মরণে বড়বাড়ীর আর কে রোডের সাদেকনগর ত্রিমোহনীতে স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। যে শহীদদের স্মরণে ২০ শতক জমির ওপর স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছেন সাবেক উপমন্ত্রী দুলুর বাবা স্থানীয় পাংগাটারী লক্ষ্মী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বড়বাড়ী ইউয়িনের তৎকালীন চেয়ারম্যান শহীদ আবুল কাশেম, রংপুর কারমাইকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদের ভিপি মুখতার ইলাহী প্রমুখ।

শহীদ মুখতার ইলাহীর বড় ভাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. কে মউদুদ ইলাহী বলেন, 'যারা আমাদের জন্য একটি দেশ, জাতি-পরিচয় ও পতাকা উপহার দিয়ে আত্মত্যাগ করে গেছেন, তাদেও সশ্রদ্ধ সম্মান জানানোর জন্য এরূপ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রয়োজন আছে। জীবিতদের উদ্দেশে বা লক্ষ্য করে কখনও এমন নির্মাণকাজের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের কোথাও এমন নজির আছে বলে আমার জানা নেই। এখন যারা জীবিত, তাদের অবদান ও কৃতকর্ম বিচার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মই নির্ধারিণ করবে কোনো স্মতিসৌধ নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে কি-না। জীবদ্দশায় নিজেরই তত্ত্বাবধানে স্মৃতিসৌধে নিজেদের ছবি আঁকিয়ে দেওয়া কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

আসাদুল হাবীব দুলু অবশ্য ছবি দিয়ে স্মৃতিসৌধের দলীয়করণ করা হয়েছে এমন অভিযোগ মানতে নরাজ। তিনি বলেন, এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লঙ্ঘিত হয়নি এবং স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কাউকে স্থান দেওয়া হয়নি। তিনি জানান, অনুমোদনকৃত ডিজাইন ও থিম অনুযায়ী স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধের ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে অনুষদ) সাবেক জিএস এবং চারুকলা শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী প্রামাণিক।

ডিজাইনার রুস্তম আলী প্রামাণিক বলেন, বড়বাড়ী স্মৃতিসৌধের স্তম্ভে টাইলস দিয়ে করা ম্যুরালে মুক্তিযুদ্ধকেই মূর্ত করা হয়েছে। তার দাবি, সৌধের নকশা করার সময় 'স্মরণীয় ও বরণীয়'-এ ধারণা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। তাই মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে দেশ গঠন ও কৃষি বিপ্লবে শহীদ জিয়ার অবদান বোঝাতে তার দুটি ছবি যুক্ত

করা হয়েছে। নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ বোঝাতে বাংলা বর্ণমালা এবং শিক্ষাদানরত খালেদা জিয়ার একটি ছবি ব্যবহার করেছেন। নিরক্ষরমুক্ত প্রথম জেলা লালমনিরহাট এবং লালমনিরহাটের উন্নয়ন বোঝাতে উন্নয়নের রূপকার সাবেক উপমন্ত্রী দুলুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

স্মৃতিসৌধে জীবিত মানুষের ছবি রাখায় ক্ষুব্ধ লালমনিরহাটের মুক্তিযোদ্ধারা। সরেজমিনে লালমনিরহাট জেলায় গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে এমন ক্ষোভের কথা শোনা গেছে। জেলার একমাত্র বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন (অব) আজিজুল হক কলেন, স্মৃতিসৌধে জীবিত কোনো মানুষের ছবি থাকা ঠিক নয়। এ কথা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের লালমনিরহাট সদর উপজেলা কমান্ডে গিয়ে আলাপ হলো কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিক, ডেপুটি কমান্ডার ফরিদ হোসেলসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে। তারা সবাই একবাক্যে স্মৃতিসৌধের ম্যুরালটি সংস্কারের দাবি জানালেন। ওই সময় সেখানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন বলেন, এটা করে দুলু সাহেব তার বাবা শহীদ আবুল কাশেমকে অপমান করেছেন। এটি স্মৃতিসৌধের নগ্ন দলীয়করণ। স্থানীয় সাংবাদিক ও কবি আবদুর রব সুজন বলেন, স্মৃতিসৌধটি যখন নির্মিত হয় তখন লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন সাবেক সাংসদ আবুল হোসেন। ওই সময় বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, স্মৃতিসৌধের দলীয়করণের জবাব একদিন জনতার আদালতে দিতে হবে। তিনি এখন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে শয্যাশায়ী। আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের এ নিয়ে মাথাবাথা আছে বলে মনে হয় না। স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের সময় খবর পরিবেশনের কারণে তাকেও অনেক হুমকির শিকার হতে হয়েছে জানিয়ে আবদুর রব সুজন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে গড়া এই স্মৃতিসৌধ এখনও ওই অবস্থায় রয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এটি লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃত্বের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার নজির। এটি যদি ওই অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে নতুন প্রজন্ম ভুল বার্তা পাবে। অবিলম্বে এটি পরিবর্তন করা হোক। কেননা, এটি নির্মিত হয়েছে সরকারি অর্থায়নে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও লালমনিরহাট জেলা পরিষদের প্রশাসক মতিয়ার রহমানের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বড়বাড়ী এলাকায় এখনও বিএনপি-জামায়াতের আধিপত্য রয়েছে। এটি সাবেক উপমন্ত্রী দুলুর নিজের ইউনিয়ন এবং ওই ইউনিয়নে তার অনেক অন্ধ অনুসারী রয়েছে। কিছু করতে গেলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত-

সহিংসতা ঘটতে পারে। তবে বড়বাড়ী আইর খামার ডাকবাংলো এলাকায় এখানে একাত্তরে নির্মম গণহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল, ঠিক সেখানেই আরেকটি স্মৃতিসৌধ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে জেলা পরিষদের।

সমকাল । ২০-১২-২০১৫। রাজীব নূর ও ফরহাদ আলম সুমন-এর সরেজমিন প্রতিবেদন।

রংপুরে নবনির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ : নাম নেই দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার!

রংপুরে নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে। আবার অনেক শহীদের নাম নেই। সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হওয়া স্থানীয় দুই বীর মুক্তিযোদ্ধ খোন্দকার মুখতার ইলাহী ও মিজানুর রহমান রনির নাম স্মৃতিস্তম্ভে স্থান পায়নি। এ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

শহরের ঐতিহ্যবাহী কালেক্টরেট মাঠের একটি অংশে সুরভি উদ্যানের পূর্ব কোণে গত পাঁচ মাস আগে স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণকাজ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গণপূর্ত বিভাগ সাড়ে ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করে। বর্তমানে নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এখনো হয়নি। শিগগিরই উদ্বোধন করা হবে।

স্মৃতিস্তম্ভের বুকে জেলার আট উপজেলার মধ্যে পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ বাদে ছয় উপজেলার মোট ৩৬ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে। কিন্তু এতে জেলার দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মুখতার ইলাহী ও মিজানুর রহমানের নাম নেই। আরো অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামও নেই। মুখতার ইলাহী লালমনিরহাটে এবং মিজানুর রহমান কুষ্টিয়ায় শহীদ হন। মুখতারের বাড়ি শহরের ধাপ এলাকায়। আর মিজানুর রহমানের বাড়ি শহরের পাকপাড়ায়। দেশ স্বাধীনের পর দুজনের নামে পৌরসভার পক্ষ থেকে দুটি রাস্তার নামকরণ করা হয়।

স্মৃতিস্তম্ভে মুখতার ইলাহীর নাম বাদ পড়ায় তার ছোট ভাই মারুফ ইলাহী বলেন, বিষয়টি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে জানানো হয়েছে। রংপুরবাসী আমার ভাইয়ের নাম বাদ দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন মেনে নেবে না।

অপরদিকে মিজানুর রহমানের বন্ধু ডা. মফিজুল ইসলাম মান্টু বলেন, এভাবে বিকৃতি করা হলে প্রকৃত ইতিহাস হয়তো মানুষ একসময় ভুলে যাবে। বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের মুজিব বাহিনীর প্রধান মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজ বলেন, এই ইতিহাস বিকৃতির জন্য প্রয়োজনে রংপুরবাসী আন্দোলন শুরু করবে।

গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ঈশা হক জানান তাদের তালিকা দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী তারা লিখেছেন।

স্মৃতিস্তম্ভে বিশিষ্ট দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম না থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা হতবাক হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে প্রেসক্লাবের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সদরুল আলম দুলু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে এসব বীর শহীদের নাম না থাকায় বিষয়টি দুঃজনক।

রংপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন বলেন, এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ। নাম বাদ দিয়ে ইতিহাস বিকৃতি করলে পরিণাম খারাপ হবে।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, শহীদ মুখতার ইলাহী বা রনি রহমান নয়, এমন অনেকের নাম বাদ পড়েছে। যারা সরকারিভাবে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান তাদেরই নাম এই তালিকায় আনা হয়েছে। তিনি এটি উদ্বোধনের আগে সংশোধনের দাবি জানান।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামের সঙ্গে গতকাল সোমবার যোগাযোগের চেষ্টা করে পাওয়া না গেলেও তার পিএ মোহম্মদ মুরাদ বলেন, এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণে জেলা প্রশাসনের কোনো ভূমিকা ছিল না।

প্রথম আলো । ২৭-৫-২০০৫। আরিফুল হক রুজু'র প্রতিবেদন।

শ্যাওলা ও ময়লায় ঢাকা পড়ে আছে রংপুরের স্মৃতিস্তম্ভ দুটি

রংপুর শহরের সুরভি উদ্যান ও দখিগঞ্জ বদ্যভূমিতে অবস্থিত দুটি স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থা বেশ নাজুক। সুরভি উদ্যানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটির একটি অংশ ২০০৬ সালের মে মাসে কে বা কারা ভেঙে ফেলে। ভেঙে ফেলা অংশটি গত দুই বছরেও মেরামত হয়নি। স্মৃতিস্তম্ভ ও তার আশপাশের এলাকা ময়লা-আবর্জনায় ভরে গেছে, জমেছে শ্যাওলা। দখিগঞ্জ বধ্যভুমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটিরও একই হাল।
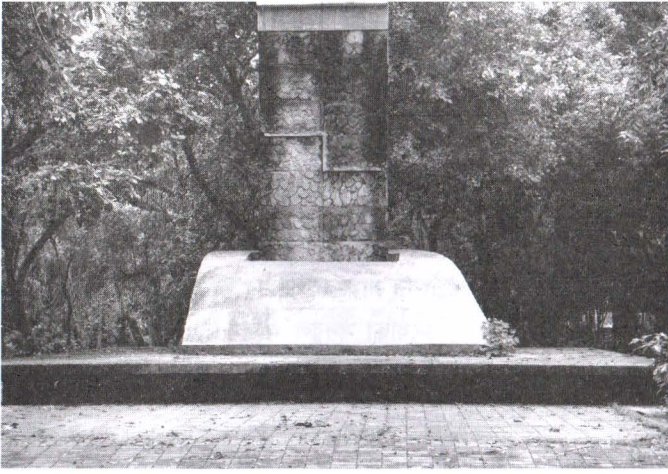
রংপুরের সুরভি উদ্যানে নির্মিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভটি অরক্ষিত পড়ে আছে

গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ণে এবং জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সাড়ে ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে সুরভি উদ্যানের স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণকাজ শেষ হয় ২০০৫ সালের আগস্টে। সেই স্তম্ভের গায়ে জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নামের তালিকা লেখা হয়। সেখানে জেলার আট উপজেলার মধ্যে পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপজেলা বাদে ছয়টি উপজেলার মোট ৩৬ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম স্থান পায়। এদিকে দখিগঞ্জ বধ্যভুমিতে গণপূর্ত বিভাগ ২০০৫ সালের জুনে সাত লাখ টাকা ব্যয়ে অপর স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করে। কিন্তু সেটিও দীর্ঘদিন ধরে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

রংপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামই স্মৃতিস্তম্ভে লেখা হয়নি।'

এ প্রসঙ্গে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী সুরভি উদ্যানের স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। তবে জনগণের জন্য সেটি উন্মুক্ত না করার বিষয়টি তিনি অবগত নন বলে জানিয়েছেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কল্লোল কুমার চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, 'নামের তালিকা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠনো হয়েছে। এখনো উত্তর পাওয়া যায়নি। আর বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভটি খুলে দেওয়ার জন্য কী করণীয় সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রথম আলো । ১৯-৭-২০০৮।

রংপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ
বাদ পড়াদের নাম দুই বছরেও সংযোজন করা হলো না

রংপুরে শহীদদের নামের তালিকার স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করেছে দুই বছর হল। কিন্তু প্রথম থেকেই অভিযোগ ওঠে, ওই স্মৃতিস্তম্ভে অনেক শহীদের নাম বাদ পড়ে গেছে। দীর্ঘ সময়েও তালিকা সংশোধন না করায় লোকজনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের পর সেই বছরের ২৮ ডিসেম্বর এর একটি অংশ কে বা কারা ভেঙে ফেললেও তা সংস্কার করা হয়নি এবং এখনো তা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শহরের ঐতিহ্যবাহী কালেক্টরেট মাঠের সুরভি উদ্যানের পূর্ব কোণে ২০05 সালের আগষ্ট মাসে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে তা ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এটি নির্মাণ করে গণপূর্ত বিভাগ। নির্মাণ ব্যয় হয় প্রায় ১০ লাখ টাকা। সেই স্মৃতিস্তম্ভের বুকে জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নামের তালিকা লেখা হয়। সেখানে জেলার আট উপজেলার মধ্যে পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপজেলা বাদে ছয়টি উপজেলার মোট ৩৬ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখা হয়। বাদ পড়ে যায় অনেক শহীদের নাম। স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ মুখতার ইলাহীর নাম বাদ পড়ায় তাঁর ছোট ভাই মারুফ ইলাহী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বিষয়টি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে জানানো হয়েছে।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল ইসলাম জানান, শুধু শহীদ মুখতার ইলাহী নয়, রনী রহমানসহ অনেকের নাম বাদ পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সদরুল আলম দুলু বলেন,'ভুল

ধরা পড়ার এত দিন পরও তা সংশোধন না করার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি অবিলম্বে এ ভুল সংশোধন করে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের সঠিক তালিকা স্মৃতিস্তম্ভে স্থাপন করার দাবি জানাচ্ছি।'

জানা গেছে, উল্লেখ করার মতো যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের মধ্যে খোন্দকার মুখতার ইলাহী ও রনী রহমানের নামে পৌরসভার পক্ষ থেকে দেশ স্বাধীনের পর দুটি রাস্তার নামকরণও করা হয়েছে।

গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল পাশা জানান, তাদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুযায়ী ওই তালিকা লেখা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কল্লোল কুমার চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, 'নামের তালিকার বিষয়টি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। আশা করি শিগগিরই এর সমাধান হবে।'

প্রথম আলো। ২৯-১২-২০০৭।

রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভূক্তির দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রংপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ খোন্দকার মুখতার ইলাহী ও রনী রহমানের নাম অন্তর্ভুক্ত এবং ২৬ মার্চ স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধনের দাবিতে গত শনিবার মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে এক ঘন্টার মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন, রংপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, পৌর মেয়র এ কে এম আবদুর রউফ মানিক, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আফজাল, শহীদ রনী রহমানের বড় ভাই মাসুদুর রহমান, শহীদ মুখতার ইলাহীর ছোট ভাই মারুফ ইলাহী, জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর আহমেদ, পৌর কাউন্সিলর নুর

মোহাম্মদ, জাসদ নেতা আজিজুল হক, মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংসদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গোলাপ, সহ-সভাপতি আফজাল হোসেন সাবু ও সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা ২৬ মার্চের আগেই ওই দুই মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্তি এবং ২৬ মার্চ স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধনের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের আগস্টে রংপুর শহরের প্রধান সড়কের পাশে সুরভি উদ্যানে ওই স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গণপূর্ত বিভাগ সাড়ে ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করে। রংপুরের পীরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপজেলা বাদে অন্য ৬ উপজেলার মোট ৩৬জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে ওই স্মৃতিস্তম্ভে। কিন্তু এতে জেলার দুই শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামসহ বেশ কয়েক জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর মধ্যে রয়েছেন রংপুর শহরের ধাপ এলাকার খোন্দকার মুখতার ইলাহী এবং শহরের পাকপাড়ার মিজানুর রহমান রনি। এদের একজন লালমনিরহাট এবং অন্যজন কুষ্টিয়ায় যুদ্ধে শহীদ হন। দেশ স্বাধীনের পর দু'জনের নামে রংপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরে দু'টি রাস্তার নামকরণও করা হয়।

বাংলাদেশ সময়। ৯-৩-২০০৯।

Putting plaque on Rangpur memorial seems uncertain

Putting plaque on the memorial for the martyred freedom fighters at Shuravi Udyan adjacent to the town's collectorate ground has become uncertain as the plaque could not be completed in the last six years.

Local freedom fighters expressed their dissatisfaction over the delay in putting the plaque and called upon the authorities concerned to complete the work correcting the list of the martyred freedom fighters and including names of those not mentioned in it.

Construction of the memorial having 36 names of martyred freedom fighters of six upazilas of Rangpur district in the plaque was started in August 2005 with the financial assistance of the Liberation War Affairs Ministry at a cost of Tk. 10.50 lakh.

A few agitated people demolished the plaque in 2006 as names of two martyred freedom fighters – Khondkar Mukhtar Elahi and Roni Rahman of Sadar Upazila – were missing from the plaque.

Mosaddeque Hossain Bablu, commander of the Rangpur district Muktijhoddha Sangsad, said a good number of names of martyred freedom fighters were not included in the plaque.

Rangpur Sadar upazila Muktijhoddha Sangsad commander Jasim Uddin said, it is regrettable that the memorial plaque was not completed in the last six years. He demanded quick completion of the work.

Contacted, BM Enamul Hoque, deputy commissioner of Rangpur, said that the matter of dropping names of two martyred freedom fighters from the plaque was brought to the notice of the Ministry of Liberation War Affairs. We are waiting for necessary steps now, he added.

The Daily Star, 21- 12- 2011. (UNB, Rangpur).

একজন শহীদকে বারংবার হত্যা : প্রসঙ্গ শহীদ মুখতার ইলাহী

কে. মউদুদ ইলাহী

বেলাল মোহাম্মদের কথা দিয়ে শুরু করি *মুক্তিযোদ্ধা কোনো ভিখারি নন যে হাত পেতে কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করবেন। তাঁকে তার মাতৃভূমি স্বদেশ ভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি সংগ্রাম করে উদ্ধার করতে হয়েছিল, মুষ্টিভিক্ষা হিসেবে একমুঠো মাটিও তাঁর হাতে কেউ তুলে দেয় নি। দেশ ও জাতির কাছে তাঁর কিছুই প্রাপ্য নেই, বরং তাঁর কাছেই দেশ ও জাতির দাবি অফুরন্ত। কি পেয়েছি নয়, কি দিয়েছি এবং কি দেবো, সেই হোক আমাদের কর্তব্যবোধ'* (বেলাল মোহাম্মদ। ১৯৯৩। স্বাধীন বংলা বেতার কেন্দ্র। ঢাকা অনুপম)।

এখন আমাদের কর্তব্যবোধটি প্রশ্নবিদ্ধ!

শহীদ মুখতার ইলাহী বা তাঁর মত অসংখ্য জীবিত বা মৃত কেউ-ই কোন প্রতিদান বা পুরস্কারের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নাই। দেশের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা, একটি স্বাধীন জাতিসত্ত্বা এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদর্শ তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁদের আত্মত্যাগের ফসল আজ আমরা, বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করছি। এক কথায় তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালন করে গেছেন। কিন্তু আজ যারা তাঁদের আত্মত্যাগের ফসল ভোগ করছি – আমরা তাদের জন্য এযাবৎ কি করেছি?

শহীদ মুখতার ইলাহী'র প্রসঙ্গই এখানে আলোচনা করবো।

১৯৭২ - ১৯৭৫। ইতিপূর্বে একটি অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই, যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জেল থেকে মুক্তির পর লন্ডন হয়ে স্বাধীন বংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর অন্যতম কাজ ছিলো বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই কাজটি তিনি করলেন প্রতিটি জেলার প্রশাসকদের মধ্যমে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্বীকৃতিপত্রসহ প্রতীকি অনুদান শহীদ পরিবারদের নিকট প্রেরণ করে। শহীদ মুখতার ইলাহীর বেলায়ও তাই ঘটেছিল কিন্তু তাঁর পিতা-মাতার প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নধর্মী (প্রাসঙ্গিক অধ্যায়সমূহ দ্রষ্টব্য)। এই সময় জেলা প্রশাসন রংপুর

শহরের প্রধান সড়কটির (ধাপ, জেল রোডসহ রংপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত) নামকরণ করা হয় 'শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী'। অনুরূপভাবে অন্যান্য শহীদদের নামেও বিভিন্ন সড়কের নামকরণ হয়।

১৯৭৫ - ১৯৭৯। কিছু পাকিপন্থী সামরিক সদস্য ও তাদের রাজনৈতিক দোসর দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাতের উদ্দেশ্যে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পরিবারের সদস্যসহ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এখানে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই হত্যাকান্ডকে সুদূর-প্রসারী একটি ষড়যন্ত্রের কথা বলবো। কিন্তু আজও (২০১৬) আমাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা হচ্ছে যে, ঘটনাটি 'কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য ঘটিয়েছে'। যাইহোক, ১৯৭৫-এর আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরপরই জিয়া আমলে রংপুর শহরের প্রধান সড়কটির নাম মুছে ফেলা হয় – সড়কের সমস্ত স্থানে 'শহীদ মুখতার ইলাহী'র নামের নামকরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। উদ্দেশ্য – নতুন প্রজন্ম যেন তাকে ভুলে যায়। শহীদ মুখতার ইলাহী'কে প্রথম হত্যা করা হলো।

১৯৮০ - ১৯৯১। এরশাদ আমলের পুরো সময়কালে শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী পাকা-পোক্তভাবে স্বাধীনতা–পূর্ব 'স্টেশন রোড' হয়ে যায়। এর সাথে অন্যান্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবিদের নামে অন্যান্য সড়কের নাম ফলকসমূহ প্রশাসনের অদৃশ্য ইঙ্গিতে রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৯৮৯-৯১ সালের প্রথম তত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। এবার শহীদ মুখতার ইলাহী'কে দ্বিতীয়বার হত্যা করা হলো।

১৯৯১ - ১৯৯৬। বিএনপি সরকারের প্রথম আমল। এ সময়কালে জিয়া-এরশাদ আমলের ধারা অব্যাহত থাকে। জামাতে ইসলামী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বর্ণযুগ। এ সময় লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ীতে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। এ সর্ম্পকে ইতিপূর্বে একটি অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়ার সিরামিক খন্ড চিত্রের সাথে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং একজন স্থানীয় শীর্ষ নেতার চিত্র স্থান পেয়েছে। শেষোক্ত দুইজন এখনও জীবিত – জীবিত ব্যক্তির চিত্র-শোভিত কোন স্মৃতি মিনার শোভনীয় নয় বরং এতে তাদের অসম্মান করাই হয়। কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্মৃতি কর্মটি ব্যক্তি পূজার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে, শহীদদের নাম ফলকটি মার্বেল বা অনুরূপ বস্তু দিয়ে না উৎকীর্ণ না করে, প্লাসটিক হরফ দিয়ে যেন-তেন ভাবে লিখে আঠা দিয়ে আটকানো হয়েছে। এ ফলকে শহীদ মুখতার ইলাহী'র নাম ছিল বটে কিন্তু অন্যদের নামের সাথে কিছু

কালের মধ্যে সমস্ত নাম ভেঙ্গে/খুলে/খসে পড়ে। এখন শহীদদের নামবিহীন তথাকথিত স্মৃতি মিনার ব্যক্তিপূজার প্রতীক হয়ে রয়েছে।
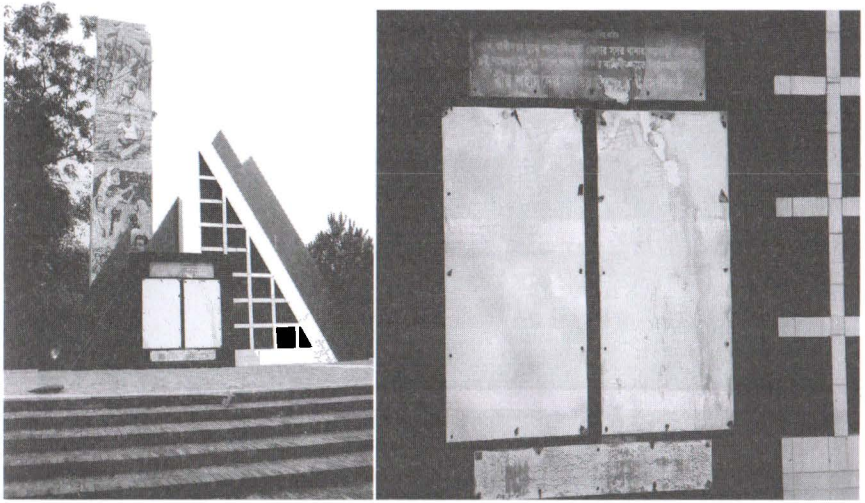
বড়বাড়ীতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মরণে স্মৃতি মিনার

অপর দিকে, 'মৃতের কফিনে শেষ পেরেক মারা'র মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে শহীদ আবুল কাশেম (যিনি মুখতারের সাথে আইর খামারে গণহত্যার শীকার হন এবং এই সময়কার একজন মন্ত্রীর পিতাও বটে)-এর নামে এই এলাকায় একটি দর্শনীয় উচ্চ-বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তা সত্বেও আইর খামার প্রাথমিক স্কুল/ডাক বাংলো প্রাঙ্গনে শহীদ মুখতার ও তাঁর বালক সহযোদ্ধার (এখনও যার নাম জানা যায় নি) কবরের দক্ষিণ দিকে সস্তা টিন দিয়ে একটি হাই স্কুল রাতারাতি তৈরী হযে যায়, যাতে কবরটি দক্ষিণের মহাসড়ক থেকে দৃশ্যমান না হয়। শুধু তাই না, কবরটির দুই পাশে দুইটি পাকা শৌচাগার (টয়লেট) নির্মাণ করা হয়! (চিত্র দ্রষ্টব্য) এখন ভগ্নপ্রায় তথাকথিত হাই স্কুল যা নাকি প্রথম থেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীবিহীন শহীদদের কবরটিকে আড়াল করে আছে। স্কুল কাঠামো ভগ্নপ্রায়, তবে পাকা শৌচাগার দু'টি অপকর্মীদের কৃতিত্ব ধরে রেখেছে। এখানে অন্যান্য শহীদদের প্রথম এবং শহীদ মুখতার ইলাহী'কে তৃতীয়বার হত্যা করা হলো।
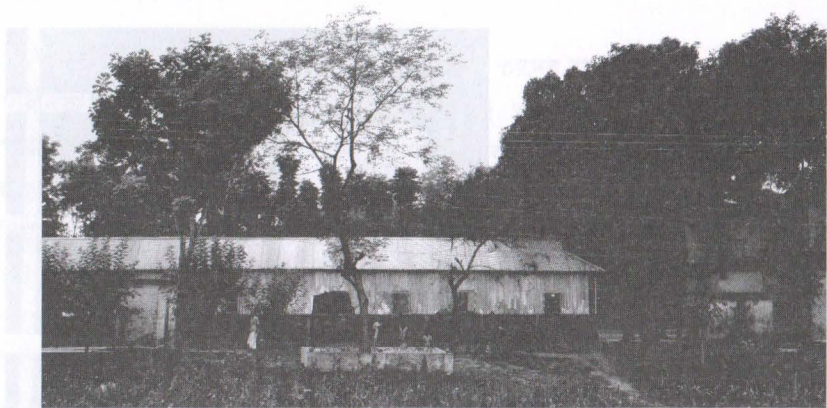
আইর খামারে শহীদ মুখতার ইলাহী ও অজ্ঞাতনামা সহযোদ্ধার কবরের উভয়পাশে পাকা শৌচাগার এবং টিন নির্মিত ভগ্নপ্রায় হাই স্কুল (উপরের ছবি উত্তর দিকের অংশ)

আইর খামারে শহীদ মুখতার ইলাহী ও অজ্ঞাতনামা সহযোদ্ধার কবরের সামনে টিন নির্মিত ভগ্নপ্রায় হাই স্কুল (নিচের ছবি দক্ষিণ দিকের অংশ)

১৯৯৬ - ২০০১। প্রায় ২৪ বৎসর পর আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এই প্রথম রংপুর শহরের কেন্দ্র স্থলে পায়রা চত্বরে শহীদদের স্মরণে একটি সুদৃশ্য স্মৃতি ফলক তৈরী হয়। এই ফলকে রংপুর শহরের শহীদদের টেরাকোটা চিত্র (Plaque) স্থায় পায়; দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় শহীদ মুখতার ইলাহী'র মুখ চিত্র রয়েছে। এর সাথে সাথে সেই স্টেশন রোডের প্রতি স্থানীয় প্রশাসন ও রংপুরবাসীর দৃষ্টি পড়ে। প্রধান সড়কের জেলা প্রশাসকের বাস ভবনের নিকটস্থ মোড় থেকে পৌর-বাজার পর্যন্ত শহীদ জররেজ মিয়া'র নামে এবং তার পর থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত শহীদ মুখতার ইলাহী'র নামে নামফলক স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সড়কের দোকান-পাটের কিছু সাইন বোর্ডে নিজস্ব উদ্যোগে শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী উল্লেখ করা হলেও স্থানীয় বা জাতীয় প্রশাসনের উদ্যোগের অভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নামফলকের সাথে তাঁর নাম সর্বত্র যোগ হয় নি। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় কিছু অবাঙ্গালী ও পাকিপন্থী রাজনৈতিক দলের আপত্তি ছিল যে, তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্সের ঠিকানায়
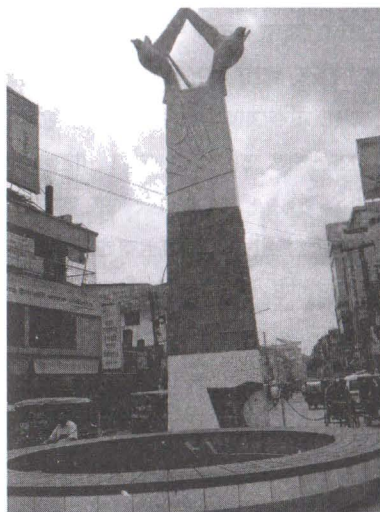
পায়রা চত্বরে শহীদদের স্মরণে একটি সুদৃশ্য স্মৃতি ফলক

'স্টেশন রোড' নামটি বহাল রয়েছে এবং এজন্য পৌর-সভার প্রযোজনীয় বিধিগত নির্দেশ প্রয়োজন। পৌর প্রশাসনও শহীদদের গৌরবময় অবদান তখন বিস্মৃত হয়েছে - এই বিধিগত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেননি। শহীদ মুখতার ইলাহী'কে চতুর্থবার হত্যা করা হলো।

রংপুর নগরীর প্রধান সড়কের পুরাতন নাম এবং শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী নামের সংমিশ্রণ

২০০১ ২০০৬। বিএনপি এবং জামাতে ইসলামী'র শাসনামল। কিছু হাতে গোনা প্রতিষ্ঠানের নামফলকে তখনও শহীদ মুখতার ইলাহী'র নাম রয়ে গেছে তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ব নামই রয়েছে। প্রশাসন তাঁর সর্ম্পকে প্রচ্ছন্নভাবে বিস্মৃত হয়েছে। এখন বিস্মৃতিকে পাকা-পোক্ত করার সময়। প্রক্রিয়া হলে – প্রতি জেলা সদরে শহীদদের নামাঙ্কিত স্মৃতিফলক নির্মাণ। রংপুরেও এমন একটি স্মৃতি ফলক নির্মিত হলো। সেখানে শহীদ মুখতার ইলাহীসহ বেশ কিছু শহীদদের নাম নেই! তৎকালীন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভাষ্য হলো: শহীদ মুখতার ইলাহী'র নাম সরকারের শহীদদের ভাতা–প্রাপ্ত তালিকায় নেই! পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই নিবন্ধের প্রথম অংশে (১৯৭২- ১৯৭৫ অংশ এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) যেখানে ভাতা–ভোগী না হওয়ার একটা কারণ হয়তো পাওয়া যাবে। অপর যুক্তি এ প্রসঙ্গে ছিল যে, তিনি লালমনিরহাটে (এখন জেলা) বড়বাড়ি ইউনিয়নে শহীদ হয়েছেন, কাজেই রংপুরের ফলকে তাঁর নাম কেন থাকবে? এমন জ্ঞান-পাপীদের মস্তিস্কে তথ্য ছিল না যে ঐ সময় লালমনিরহাট রংপুর জেলার একটি মহকুমা ছিল । তবে নেপথ্যে ঐতিহাসিক কারণ ছিল যে – মুখতার ইলাহী ৬ নম্বর সেক্টরে রংপুর জেলার বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (BLF) যা 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত, তার জেলা প্রধান/কমান্ডার ছিলেন। বিষয়টি সরকারের জন্য ভয়ংকর তথ্য ছিল। তাই তার নাম, স্মৃতি ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করতে হবে। শহীদ মুখতার ইলাহী'কে পঞ্চমবার হত্যা করা হলো।

তবে রংপুরবাসী কৃতঘ্ন নয়। দেশের মুক্তিযোদ্ধারা এখনও যোদ্ধা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। তাঁদের কাছে এই স্মৃতি ফলক ছিল কলঙ্কময়। ফলকটি স্থাপনের প্রায় এক মাসের মধ্যে নামাঙ্কিত মার্বেল খন্ডগুলি উৎপাটন করে ফেলা হয়। ফলকটি আজ পর্যন্ত নাম শুন্য।

২০০৭ - ২০০৮। সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট তত্বাবধায়ক আমল। প্রায় দুই বছরের এই সময়কালে শহীদ মুখতার ইলাহীসহ অন্যান্য সড়কের নাম পূর্ববর্তী অবস্থায় রয়ে যায়। এই নিস্পৃহবস্থা প্রকারন্তরে গত আমলের সরকারের ধারাবাহিকতা ধরে রাখে বলা যায়। বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাকা শৌচাগার ও ভগ্নপ্রায় টিনের স্কুলটিও শহীদদের অবমাননার স্বাক্ষর হিসেবে রয়ে যায়। শহীদ মুখতার ইলাহী'র ষষ্ঠবার হত্যা এই সময় কালে।

২০০৯ - বর্তমান। আওয়মী লীগ জোট সরকারের প্রায় দুই-দফা মেয়াদকাল। উন্নয়ন এবং অর্থনেতিক-সামাজিক বিকাশের অব্যাহত ধারার এই সময়কাল বাংলার মানুষকে নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের কতিপয় ধারা পুঃস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও পাকি-মিত্রদের মধ্যে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু শীর্ষ কুশীলবদের ফাঁসি/শাস্তি কার্যকর হয়েছে। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বেশ কয়েকজনের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। ৪-নেতার জেলে হত্যার বিচার কাজও শুরু হয়েছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী চক্র এখনও ক্রিয়াশীল – কাজ চলছে সূক্ষ্মভাবে ধর্মের মুল দর্শন অবজ্ঞা করে, অপব্যাখ্যা করে। এমন পরিবেশে সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে যাতে তাঁরা একটা সম্মানজনক সামাজিক অবস্থানে থাকে। ১৯৯৬-৯৮'এ রংপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে পায়রা চত্বরে শহীদদের টেরাকোটা ফলক স্থাপনের প্রায় তিন দশক পর শহীদ মুখতার ইলাহী'র ১৯৭০-৭১'এর সংগ্রামের প্রধান কর্মক্ষেত্রে (এখনকার কারমাইকেল কলেজের অংশ, বর্তমান বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও তাঁর সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যেমন তাঁর প্রতি বিরল সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তেমনি তাঁরা নিজেদেরও সম্মানিত করেছেন।

তবে, এখনও বহু শহীদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধা – যাঁরা প্রকাশ্যে কোন প্রতিদান বা পুরস্কার আশা করেন নি কখনও, যাঁদের কাছে রাষ্ট্রীয় ভাতা গুরুত্বপূর্ণ নয় বা ছিল না - অর্থাৎ 'ভাতা-ভোগী' নন – তাঁরা কি দেশ মুক্তির স্বীকৃতির জন্য অপাংতেয় হয়ে থাকবেন? এরা সকলেই

শহীদ মুখতার ইলাহী হল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর (২০১৬)

বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শীকার হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুখতার ইলাহী'র আত্মত্যাগের পর একারণেই তাঁর স্মৃতিকে বারবার হত্যা করা হয়েছে।

শেষ কথা

আবার বেলাল মোহাম্মদ (১৯৯৩)-এর উক্তি দিয়েই শহীদ মুখতার ইলাহী'র বারংবার স্বীকৃতি-স্মৃতি হত্যার এ নিবন্ধটির সমাপ্তি টানি, *স্বীকৃতি? কে কাকে স্বীকৃতি দেবে? একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মহত্তম স্বীকৃতিই হচ্ছে একটি মুক্ত স্বাধীন-দেশ পরিবেশ যেখানে দখলদার উৎপীড়কদের পদচারণার সন্ত্রাস নেই। এই স্বদেশ ভূমির একটি মানচিত্র প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার বুকের পাতে সহজ স্নিগ্ধ আঁকা হয়ে আছে তার চেয়ে অধিকতর মহিমান্বিত কোন আনুষ্ঠানিক স্বর্ণপদক হতেই পারে না'*। শহীদ মুখতার ইলাহী তাঁর কর্তব্যটি করে গেছেন – দেশের জন্য, আপনাদের জন্য। আপনারা কি আপনাদের কর্তব্য পালন করেছেন? শহীদ মুখতার ইলাহী আর যেন হত্যার শীকার না হন, এই আমাদের প্রত্যাশা ।

ডঃ কে. মউদুদ ইলাহী শহীদ মুখতার ইলাহী'র অগ্রজ এবং ঢাকাস্থ স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর প্রফেসর এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। নিবন্ধটির প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার জন্য স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর-কে ধন্যবাদ।

অতঃপর করণীয় এবং কার করণীয়!

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, আমার তখন শিশুকাল। মনে পড়ে, ১৯৭১-এ মা-বাবার সাথে পালিয়ে বেড়ানো - খুলনা থেকে যশোর, মাগুরা, জিনজিরা, আরও কত জায়গা। এই দেশের জন্য আমাকে সংগ্রাম করতে হয় নি এক বিন্দুও। কিন্তু এখন স্বাধীনতা ও মুক্তি যুদ্ধের আদর্শ রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছি, কেননা ছাত্র জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বারবার শিখতে হয়েছে। কোন ইতিহাস সঠিক তা বুঝতে বুঝতে আমার শিক্ষা জীবন প্রায় শেষ তখন। কিন্তু একটা শিক্ষা লাভ হয়েছে যে, কয়েক দফা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতিপয় সরকার তাদের সুবিধামত ইতিহাস রচনা ও চর্চা করেছেন। সেখানে সমগ্র পাকিস্তান আমলে, বিশেষ করে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সময়কালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠন ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের এবং সমমনা অন্যান্য দলের দীর্ঘ আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক অবদান তার স্বীকৃতি নেই। কিন্তু এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের দাবী স্বাধীন বাংলার জন্য বাস্তবে রূপ নেয়। এহেন ঘটনা প্রবাহ ঐ সমস্ত ইতিহাসে বারবার বিকৃত করার অপচেষ্টা হয়েছে। এটাই সরলীকৃত সত্য। উপরোক্ত রাজনৈতিক পরিসরে ঐসমস্ত সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করার অপচেষ্টা হয়েছে। তারা প্রায়শঃ যে এতে সফলকাম হয়নি, তা বলা যাবে না। এর আলোকে শহীদ মুখতার ইলাহী'কে নিয়ে অপরাজনীতির কিছু বিষয়ে আলোকপাত এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়

- এই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নাম ও তাঁদের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অমুক্তিযোদ্ধা, এমন কি রাজাকারদেরও নাম অর্ন্তভূক্ত হতে থাকে।
- শহীদ মুখতার ইলাহী'র নাম ও স্মৃতি মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় রংপুর শহরে তাঁর নামে প্রধান সড়কটির নামকরণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হয়।

জিয়া হত্যা পরবর্তী সময় এবং এরশাদ আমল

- পাকিপন্থী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের ব্যাপক পুনর্বাসন করা হয়।
- শহীদ মুখতার'এর নামে রংপুরের প্রধান সড়কটির পুরাতন নাম (স্টেশন রোড) পুনর্বহাল হয়।

- লালমনিরহাট জেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নে আইর খামার গ্রামে ৭১'-এর গণহত্যা স্থানে শহীদ মুখতার ইলাহী এবং একজন অজ্ঞাতনামা বালক শহীদ সহযোদ্ধার কবর ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় তৎকালীন ডাকবাংলো ভবনটি ভেঙ্গে বধ্যভূমিটির স্মৃতি নষ্ট করা হয়।
- এই সময়ে এই এলাকায় একজন বিএনপি দলভূক্ত সদস্য মন্ত্রী ছিলেন।
- আইর খামার বধ্যভূমির পাশে শহীদ মুখতার ইলাহী ও সহযোদ্ধার কবরটি আড়াল করে হাই স্কুল নির্মাণের নামে একটি টিনশেড নির্মিত হয়।
- শহীদের কবরের উভয় পাশে স্কুলটির জন্য দুইটি পাকা শৌচাগার (টয়লেট) নির্মাণ করা হয়।
- এই স্কুলে কখনও কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি বা কোন শিক্ষক নিয়োগ হয় নাই, তবে বড়বাড়িতে অপর একজন শহীদের নামে একটি হাই স্কুল ও কলেজের কাজ শুরু হয়।

আওয়ামী লীগ সময় (১ম)

- প্রধানত পূর্বাবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। এই সময় এই এলাকার জাতীয় পার্টির একজন পার্লামেন্টে সদস্য ছিলেন।
- গণহত্যা স্থান/বধ্যভূমি সংরক্ষণ বা শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এলাকার সাংসদ এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।

বিএনপি-জামাত সময়কাল

- প্রধানত পূর্ববর্তী অবস্থা বিরাজ করে। এ সময় এই এলাকার একজন বিএনপি সদস্য পার্লামেন্টে সাংসদ ছিলেন।
- স্থানীয় সাংসদের উদ্যোগে বড়বাড়িতে আইর খামার বধ্যভূমি থেকে বেশ দূরে একটি দৃষ্টি নন্দন শহীদ স্মৃতি মিনার তৈরী হয়। কিন্তু ব্যয়বহুল মিনারে শহীদদের নাম প্লাস্টিক হরফে লেখা হয়। ফলে নামগুলি এক বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। এটি এখন শহীদদের নামহীন কিন্তু ব্যক্তিপূজার স্মারক হয়ে (২০১৬) বিরাজ করছে।

আওয়ামী লীগ সময় কাল

- রংপুর পৌর সভা 'সিটি কর্পোরেশন' মর্যাদা লাভ করে। নগরের প্রধান সড়কের ব্যাপক সংস্কার কাজের সময় 'শহীদ মুখতার ইলাহী সরণী' নাম ফলকটি উৎপাটিত হয়। সিটি মেয়র ফলকটি নতুনভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন এমন পরিকল্পনার কথা বলেছেন।
- শৌচাগার সমৃদ্ধ ভগ্নপ্রায় টিনের তথাকথিত হাই স্কুলটি যথাযথ স্থানে এখনও শহীদদের কবর আড়াল করে আছে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর-এ শহীদ মুখতার ইলাহী হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
(২৮ অক্টোবর, ২০১৫)

আইর খামার সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গনে কিছু শিক্ষার্থী এবং সম্মুখে ৭১-এর বধ্যভূমি
(ডান দিকের কোণায় তথাকথিত হাই স্কুলের অংশ বিশেষ)

- বড়বাড়িতে পূর্বাবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এলাকার আওয়ামী লীগভূক্ত পার্লামেন্ট সদস্য একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব; স্থানীয় জনগণ এখন শহীদানদের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মনে করছেন।
- বড়বাড়ী আইর খামারের মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের চেষ্টা সত্ত্বেও বধ্যভূমি রক্ষার্থে অথবা শহীদ মুখতার ইলাহী'র স্মৃতি রক্ষার্থে কোন ব্যবস্থা এযাবৎ (২০১৬) গ্রহণ করা হয়নি।
- রংপুর-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এ শহীদ মুখতার ইলাহী'র নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়।
- শৌচাগার সমৃদ্ধ ভগ্নপ্রায় টিনের তথাকথিত হাই স্কুলটি যথাযথ স্থানে এখনও শহীদদের কবর আড়াল করে রয়েছে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যাবে যে শহীদ মুখতার ইলাহী'র স্মৃতি এবং বধ্যভূমি সংরক্ষণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন উদাসীনতা বা অবহেলা লক্ষ্য করা গেছে। তবে, শহীদ মুখতার ইলাহী'র পরিবারের সদস্যবৃন্দ, তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং সর্বোপরি আইর খামার গ্রামের বাসিন্দারা তাঁর অবদান ও স্মৃতি এখনও যত্নের সাথে ধরে রেখেছেন। তাঁরা এখানে একটি নামাজ ঘর/ছোট মসজিদ তৈরী করেছেন। অপরদিকে, নতুন প্রজন্ম এমন কি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীগণ এবং তাদের শিক্ষকগণ, শহীদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যগণ শহীদ মুখতার ইলাহী'কে নিয়ে গর্ব করে থাকেন (পরিশিষ্ট - ২-এ এই এলাকার তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম দেখা যেতে পারে)। প্রতি বছর ৯ নভেম্বর দিনটি তাঁরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। শহীদ মুখতার ও তাঁর সাথে সকল শহীদদের এরূপ সম্মাননার সাথে আমরা কি যোগ দিতে পারিনা?

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী রংপুর-এর ধাপ, জেল-রোড এলাকার বাসিন্দা এবং একজন বনসাই-শিল্পী ও সমাজসেবী। নিবন্ধটি প্রকাশিত তথ্য এবং বড়বাড়ি ও আইর খামারবাসীদের অনুভূতি নির্ভর করে রচিত হয়েছে। নিবন্ধটির প্রাথমিক খসড়া পর্যালোচনার জন্য স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর-কে ধন্যবাদ।

কে. মুখতার ইলাহী'র কয়েকটি কবিতা

।। সুতরাং আপনারা হাসবেন না ছবিটা দেখে ।।

ইতিহাস ।। ক ।।

'পরর্বতী অধ্যায়' খোঁজ করা দূরলক্ষ্যদৃষ্টির
অভিযান যে কবে শেষ হবে' এ চিন্তার
কোন উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমি সব দেখিনি
এবং যা দেখেছি তাকে পরবর্তী অধ্যায় খোঁজ করার
ঠিক উদাহরণ বলা চলে না। সেটা একমাত্র ওই
মহা ঈস্পিত বস্তুটি খোঁজ করার নির্মম ইতিহাস ।

যে ইতিহাসের নির্লিপ্ত ছায়ার নীচের (আশৈশব
দেখে আসছি) কাকবসা দেয়ালের গায়ে একটি লোক
নিজের ফলিত ছায়াটার উপর হাত বুলিয়ে কাঠ কয়লা দিয়ে
নিজের ছবিটা আঁকতো যখোন তখোন কাকেরা উপর থেকে
ডাকতো (কখনোও বা বিষ্ঠাও ত্যাগ করতো) এটা বিরক্তিকর
হলেও সে বিরক্ত হতো না খুব ....।
তারপর তার সীমিত কাঠ কয়লা ফুরিয়ে গেলে
সে আবার খুঁজতে বেরোতো সৌখিন হোটেলগুলোর
উষ্ণ কিংবা শীতল পানশালার আস্তাকুড়ে অথবা উৎকটগন্ধী কাবাবের
চুল্লির আশে পাশে, তারপর নরম কয়লায় তার মুঠ ভর্তি হোলে
সে দাঁড়াতো সেই দেয়ালটার সামনে নিজের অসমাপ্ত ছবিটাকে
শেষ করতে । কিন্তু মিলোতে পারতোনা , কেননা এখানকার ছায়াটা
পড়ছে অন্যভাবে ।
অনেকে হাসতো ভাবতো : পাগলটা পাগলের মত কি করছে
রোজদিন একই দাগ কাটছে মুছছে পেট্রোল পোড়া ঘায়ের উপর
পেনিসিলিন ঘষার মত করেএকাগ্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছেঁড়া বুক

পেনিসিলিন ঘষার মত করেএকাগ্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছেঁড়া বুক
পকেটে উৎকণ্ঠা লুকিয়ে পরবর্তীর সৌন্দর্যের জন্য
চালাতো তারব্যঙ্গকৃত প্রচেস্টা

এবং প্রতিজ্ঞা ।। খ ।।

অনেকের হাসিদেখেসেলোকটা লজ্জিত ছিলোনামোটেই ।
(কেননাকারদৌড়েরসীমানাকোথায়ওভালভাবেইতাজানেপেতলগলানোরজন্যকড়াই
প্রস্তুতরয়েছেপেতলেরপ্রাচুর্যবহুসংখ্যকপৃথিবীকেকরেছেজীবানুগ্রস্থএবংসাধারণভাবে
জীবানুরমাশুলযোগাতেহচ্ছেকয়েককোটিপৃথিবীকেসুতরাংসমস্তপেতল
গুলোকেজমাকরতেহবেগলানোরজন্যএছাড়াওসবগুলোপুরনো
চাঁদরতাতেযতইচাঁদবাতারাঅথবা-তারাদিয়েহীনতাঢাকার
নিষ্ফলভেজালপ্রচেষ্টারপ্রমাণথাকনাতাপোড়ানোহবেইএবংদেয়ালেরউক্তছবিটা
আরকয়লাতেনয়ওয়াটারপ্রুফড্যাম্পপ্রুফবার্নিসদিয়েআঁকাহবে
শিল্পীকেবাধাদেয়াহত্যাকারীরপোষাকাককেদূরকরাহবে)
শিক বিঁধা কুঁচকে যাওয়াকাবাবেরমত মনটাকে
নিয়ে নাড়া চাড়া করে বুকে হাত দিয়ে চিন্তা কোরে সে
আনন্দ পায় বিশ্রামের আনন্দ। দেয়ালে কয়লার ছবি আর না
আঁকার এবং পিতল গলানোর ও চাদর পোড়ানোর আনন্দ।

।। কতিপয় আবেদন : নববর্ষের কাছে ।।

তোমার নববর্ষেরর দোহাই, হে পৃথিবী,
কয়েক জোড়া পুরোনো বছরের পিঠেক্ষয়ে যাওয়া
বেকারের মত আমাদের বিধ্বস্ত সখীদের আর
যন্ত্রণার কালো সামুদ্রিক রসে জারক বানিও না ;

দোহাই তোমার নববর্ষের, এখানকার যুবকের স্বপ্নের
প্রস্তুতির কিংবা পদচারণার গতির পেছনে নীল সোনালী
ড্রাগন লেলিয়ে বিচ্ছিরি কোরাসের হাত থেকে রক্ষা করো,

আবেদন জানাই, হে বৈশাখ, তোমার প্রথম ঝড়

উড়িয়ে দাও আম বাগানে ভিক্ষে পাওয়া
করুণা ও আবর্জনাময় আচ্ছাদনটা আমাদের উপর থেকে ।

।। দু'টি কবিতা ।।

মাকে চিনাতে

'এক সম্পন্ন গৃহস্থালীর অমূল্য সম্পদে সজ্জিতা ছিলেন আমার মাতা'
----- বললেন আমাদেরবয়োজ্যেষ্ঠ,
--- "যখন আমার মা সবুজ শাড়ীটা পেঁচিয়ে
নীল চালার নীচে ঘুরতেন এদিক সেদিক
হয়তো কখনো বা ডাকতেন আমাদের
কিংবা কখনো বা মেটে রংয়ের চোখের পাতা
বুলিয়ে দিতেন চুলের ডগা পর্যন্ত ।
আমরা তখন গেয়ে উঠতাম বৈশাখের টিয়ের মতন।"
বয়োজ্যেষ্ঠ আবার বললেন --
"তোমার মাতা কিন্তু মৃতা নন আজও
স্তন্যপানরত তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে
বানিয়েছে জনৈকা ভিখারিনী। এবং রাস্তার
ধারেক্ষারজ্বলা প্রাচীন সবুজ শাড়ী
উকুন চুল ঢাকা এক অজ্ঞাতা নাম্নী হয়ে আছেন বেঁচে - তিনি
বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিনাতে গেলেন আমাদের
আশৈশব মাতাকে----
এবং তাইতো তিনি শিকার হলেন ঘৃণ্য মাকড়সার বিষনখে।"

এখন আর নয়

তোকে আগে বহু ভয় করেছি এখন আর না
সাঁজোয়া গাড়ীর হেড লাইটের মত তোর গোঁয়ার চোখ
দু'টো আমাকে ভয় দেখিয়েছে
কিন্তু এখন আর নয়
তোর নখগুলো বেয়নটের মত হলেওনয়

অথবা পশ্চিম পূর্ব জার্মানী থেকে বাঙলা
আর সিরাজ নবাবের মত হলেও নয় কেননা
তোকে তো নিয়ত দেখছি তুই ৩০০ কোটি
অধিবাসীর মধ্য থেকে ২৭৫ কোটির হৃদপিন্ড
তোর রূপালী বরশীর মাথায় নিপুণভাবে
আটকিয়ে বিকট সমুদ্রগুলো থেকে সোনালী
রূপালী মাছ তুলে বাক্স ভরতিস অথবা
বিকট দানবের মত চিবোতিস
তখন তোর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে
আমিও ধ্যান করেছিলাম
কিন্তু এখন আর নয় ।

।। আশাময় মৃত্যুর অপমৃত্যুতে ।।

মৃত্যু যার বিকল্প খুঁজে
না পাওয়ার ফলে আমি
তার সাথে আজীবন থেকে
যাওয়ার যন্ত্রণাময় ইচ্ছে করেছিলাম
তারপর যখন মৃত্যুর অপমৃত্যু হলো
আমিও এসে ভিড়লাম
ক্ষত বিক্ষত দাগ গাল আর
হুক ওয়ার্ম ভরা পা নিয়ে
বিশাল প্রসেশনের মাঝে

তার (অর্থাৎ মৃত্যুর) অস্থির দেহ সর্বস্ব
প্রাণটাকে ছেঁচড়ে ছেচঁড়ে নিয়ে এলাম
নিষ্কৃতি নামে এক বিশাল
দোকানের সামনে
তারপর জিজ্ঞেস কররাম :
‘কিরে তোর নাকি অপমৃত্যু হয়েছে
কিন্তু কই তুই তো
সে জন্য কাঁদলিনে’

প্রশ্নে প্রিয় সখীটা মৃত্যু যার নাম
কণ্ঠে একজোড়া বকুল আর গোলাপের
মালা ঝুলিয়ে এক বিভৎস হাসি
হেসে বলরো : ভাই, তোর কাছে
আমার একান্ত অনুরোধ
বিরক্ত করিসনে'

(স্বাধীনতার পর 'মুক্তিযুদ্ধ রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, রংপুর'- এ ১৯৯৬ সালে পুণ:মুদ্রিত হয়েছিল।)

।। ১৪ই আগষ্ট একটা পতাকার নাম ।।

১৪ই আগষ্ট একটা বিশাল পতাকার নাম
যে পতাকা ঢেকে ফেলেছে একটা মানচিত্র
যে পতাকার ছায়া বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী
ঘাসবন, শহরের উপর একটা কুয়াশার চাদর
বিছিয়ে দিয়েছে আর

এ পতাকার ধুসর সান্নিধ্যে
এ দেশের সবুজ লজ্জা পেয়েছে।

১৪ই আগষ্ট একটা বিজয়ের বড় দিনের নাম
যেদিন হিটলার, সুবাষবোস পরাজিত হয়েছে
সেদিন একটা বিরাট বাড়ীতে শেষ
সম্বল হারিক্যানটাকে সুযোগের গুলতি মেরে
চূর্ণ করেদিয়ে অন্ধকারের পশমে ডুবে
কাকে যেন কারা ডেকেছিল।

সেদিন ছিলো একটা কাক ডাকা ভোর
যে ভোরের কান্নায় ডুবে আছে এখনো
জার্মানী, ভিয়েতনাম, চেকোশ্লাভাকিয়া, বাংলা।

এ দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় পলাশীর আত্মারা
সমবেত হয়েছিলো। তারা আত্মা তাই তারা
সব বুঝে ফিরে গিয়েছিলো।

তাই বার বার বলি
১৪ই আগষ্ট চিনি তোমাকে চিনি
ভালভাবেই চিনি। আর সব রসালো উৎসবের মতো
ভালভাবে চিনি। চিনি তোমাকে
আমার আচৈতন্য।

।। সূর্যের ঈপ্সায় বিধ্বস্ত জনৈক নাগরিকের অপ্রিয় সংলাপ ।।

অশ্লীল শীতের মতোআমার পৃথিবীটা
শুয়ে থাকে, শুয়ে থাকি আমিও,
আর এক মুঠ সবুজ সূর্যেরচুম্বনের একান্ত
প্রয়োজনে শিহরিত হই।

সূর্যের আকাংখায় হাত বাড়িয়েছিলাম -
(কিন্তু) সন্ধ্যার মতো একদল সোনার কাক
আমার হাতকে কাঁচের গ্লাসের মতো ভেঙ্গে
চুরমার করে দিয়েছিলো।

(কেননা) সেই কাকেরা সূর্যকে ঠুকরেখাওয়ার
প্রতিযোগীতায় ভীষণ মত্ত। (কিন্তু
সূর্য, সেত ঠুকরে খাওয়ার মতো কিছু নয়)
সূর্য অভিশাপে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো,
কাকরাও চতুর তারা বর্ষার ব্যাঙের
উধাও হয়ে
নিজেদের বাঁচিয়েছিলো।

অথচ আশৈশব সূর্যের ঘনিষ্ঠতা প্রত্যাশী
আামি এক নাগরিক তার ক্রোধময় অভিশাপে -
নির্জীব ভ্রূণের মতো নিয়ত হারিয়ে যাচ্ছি
বাতাসের সুনিকেত অনুতে কিংবা নগ্ন রাজপথের
অনিকেত দেহ রন্ধ্রে।

।। চা'এর রেস্তোরা ও সাম্প্রতিক পৃথিবী।।

পৃথিবীটা যদি একটা চা'র রেস্তোরা হয়
তবে বলা চলে :

এখানে অবাধ আসা যাওয়া আমাদের
এখানে প্রাণ খুলে হাসি
মগজ ভর্তি সিগারেটের ধোঁয়োতে চুমু রেখে চিন্তা করি
দেখি প্রচুর খদ্দের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র উপপৃথিবী নিয়ে
ব্যস্ত এখানে মালিকের মালিকানার সামর্থ অনুযায়ী
গল্প জানানোর অপেক্ষা করে না কেউ এখানে কেউ বা
নিজের পৃথিবীর প্রশংশায় পঞ্চমুখ হয়ে নিজেই
ঈশ্বর সেজেবসে আবার কেউ তার বেহায়া নিজস্ব
পৃথিবীর কথা ভীষণ দক্ষতার সাথে ফাঁপিয়ে বলে, তার
নোতুন বন্ধুর সমগোত্রীয় হতে চেয়ে কেউ আবার তার
সমশ্রেণীভূক্তকে ভূক্তভোগীরপৃথিবীর তথা নিম্‌কি
চিবানোর মতো শুকনো শব্দে বলে চলে
সান্তনা পায়

দু' একজন চায়ের উপর ঠোঁট বসাতে বসাতে
চিন্তা করে তার কটা একান্ত সম্পত্তি :
একটা ডাইরী তিনটি ফুল একটা সবুজ খাম ও
তার মমতাময় পৃথিবী

তারপর যুবক রাজনীতিক হাতে অর্ধকাপ চা
তারস্বরে চিৎকার করে বোঝায় তার সঙ্গীদের
কখনো মার্কস কখনো মাও কখনো নিকসন কখনো
ভিয়েতনাম ইসরাইল কখনো পল্টন ময়দান
শোনা যায় হাতুড়ি মার্কা কিংবা মাংসল গল্প
অথবা নিস্পৃহ হাসি

কখনো বা কারোর হাসি দেখে হাসি
কখনো বা হাসির খোরাক হয়েও হাসি
তবুও রেস্তোরার মতো পৃথিবীটাকে আমি
অফিস যাওয়া বাসটার মতো ভালবাসি

।। আমার আকাঙ্খাগুলো ।।

আমার অবিশ্রান্ত আকাঙ্খাগুলো
প্রজাপতি - রঙ্গীন পাখনা মেলে দিয়ে
উড়ে যেতে চায়
কোন নতুন ফুলের সন্ধানে কিংবা
কোন জোনাকীর মত ছায়া পথ ধরে
চলে যাওয়ার দুরন্ত ইচ্ছে নিয়ে কিংবা
গভীর রাতে কোন কবিতা আবৃত্তির
আধাঁর আধাঁর নীল মঞ্চের উপরে
উঠে অনাহুত, অবাঞ্চিত আগন্তক
হয়েও নায়কের অভিনয় করতে,
দিতে চায় পুজো প্রাচীন গ্রীক
দেবতাদের হতে চায় সেইসব
কথিত মহাপুরুষ (যারা নাকি
লবনাক্ত শরীর থেকে তপ্ত মুদ্রা বের করে
নিজেদের উত্তপ্ত রাখে যুবকের যৌন

শিহরণের মত)
পররাজ্য লোভীদের মত আমার আকাঙ্খাগুলো
উত্তপ্ত চৈত্রের বুকে ভেসে বেড়ায়,
শুঁড়িখানার উন্মাদের মত ভাসতে ভাসতে
উত্তপ্ত চিমনির মুখের কাছে এসে
পেঁজা শিমুল তুলোর মত
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
তাদের সাথে আলিঙ্গন
করতে এসে।

উপরের কবিতাগুলি কারমাইকেল কলেজ বার্ষিকী, বাংলা ১৩৭৮ থেকে সংগৃহিত।

।। দু'টি কবিতা।।

এক

কেন যেন ভুলে যাই
জীবানুগ্রস্থ ফ্যাকাসে রক্তেরকথা,
ওকে দেখলেই, মনে হয়,
জীবানুরা এ পৃথিবী ছেড়ে গেল
চারিদিকসবুজ দূর্বা হয়ে গেল।

দুই

প্রতিজ্ঞা' কর অদৃশ্য হাতে
হাত রেখে,
পাতলা রুটির মত
কাগজগুলো নিয়ে
মাথা নীচু করে
বেরিয়ে পড়বি
সেই দিন।

রংপুর থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'কলতান'- এ প্রকাশিত। তারিখ অজ্ঞাত।

লালমনিহাট জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	মুক্তিযোদ্ধার নাম ও পিতা/মাতার নাম	ঠিকানা
০১	নামঃ পদ্মলোচন রায় পিতাঃ মৃত লক্ষ্মীকান্ত রায়	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০২	নামঃ মোঃ আজিজার রহমান পিতাঃ মৃত তমিজ উদ্দিন	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৩	শ্রী ভারত চন্দ্র রায় পিতাঃ মৃত সতিশ চন্দ্র রায় মাতাঃ মৃত সন্ধ্যা রায়	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ি উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৪	মোঃ আব্দুল খালেক পিতাঃ মৃত মৈনুদ্দীন মাতাঃ মৃত কছিমন নেছা	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৫	মোঃ হায়দার আলী পিতাঃ মৃত মহিউদ্দিন মাতাঃ মৃত কছিমন নেছা	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৬	মৃত আবেদ আলী পিতাঃ মৃত রন মামুদ (আয়মন মুন্সি) মাতাঃ মৃত ছিলপন বেওয়া	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৭	মোঃ মনছুর আলী পিতাঃ মৃত রন মামুদ (আয়মন মুন্সি) মাতাঃ মৃত ছিলপন বেওয়া	গ্রামঃ সুপরাজি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

০৮	মোঃ ইয়াছিন আলী পিতাঃ মরহুম ইছামুদ্দিন মুন্সি মাতাঃ মৃত নবীজন নেছা	গ্রামঃ পূর্ব আমতলী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
০৯	মোঃ মকবুল হোসেন পিতাঃ মৃত ইসমাইল হোসেন মাতাঃ মৃত মরিয়ম নেছা	গ্রামঃ চৈতনসীতারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১০	মোঃ নাদির হোসেন পিতাঃ মৃত শহীদ ফরিদ মাহমুদ মাতাঃ মৃত মফিজন বেগম	গ্রামঃ কামাত পাড়া (পৌরসভা) ডাকঘরঃ পঞ্চগড় উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর জেলাঃ পঞ্চগড়।
১১	মোঃ গোলাম রহমান (বীরমুক্তি যোদ্ধা) পিতাঃ মৃত মনছুর আলী মাতাঃ মোছাঃ গোলাপী বেগম	গ্রামঃ বড়বাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১২	অফি উদ্দিন (বীরমুক্তিযোদ্ধা) পিতাঃ মৃত খেজমত উল্লাহ	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৩	মোঃ আঃ সামাদ পিতাঃ মৃত আফান উল্লা	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৪	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী বেওয়া মৃত জয়নাল আবেদীন পিতাঃ মৃত বছর উদ্দিন মাতাঃ মৃত জয়মন বিধি	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৫	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী মরিয়ম বেগম মৃত আব্দুল করিম পিতাঃ মৃত টাংরা মামুদ	গ্রামঃ কিংবিদ্যাবাগিশ ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৬	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী লুৎফা বেওয়া মৃত রাজ্জাক পিতাঃ মৃত আঃ মামুদ	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

১৭	মোঃ ফরিদ আলী পিতাঃ মৃত জামাত উল্লা মাতাঃ মৃত আছিরন বেওয়া	গ্রামঃ বিদ্যাবাগীস ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৮	মোঃ আঃ মান্নান পিতাঃ মৃত একাব্বর আলী	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
১৯	মোঃ আজিজুল হক পিতাঃ মৃত নইমুদ্দিন মাতাঃ মৃত আমেনা বেওয়া	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২০	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী ছকিনা বেওয়া মৃত আঃ সাত্তার পিতাঃ মৃত কালা মিয়া মাতাঃ মৃত ফুলবানু	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২১	মোঃ নুরুল ইসলাম পিতাঃ মৃত আব্দুল আজিজ মাতাঃ মৃত ছালেহা বেওয়া	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২২	এ এম শফি-উজ-জামান পিতাঃ মরহুম ডাঃ জহুর উদ্দিন আহমেদ	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৩	মোঃ ইছব আলী পিতাঃ মৃত মহিম মামুদ মাতাঃ মৃত ইছিমন বেওয়া	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৪	মোঃ সহিদার রহমান পিতাঃ মৃত আকবার আলী মাতাঃ মৃত শাহাজান নেছা	গ্রামঃ পাঠান পাড়া ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৫	আব্দুল জব্বার পিতাঃ মৃত মকবুল আহমদ মাতাঃ মৃত আমেনা খাতুন	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাড়হাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

২৬	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী জয়নেব বেওয়া মোঃ আজিজার রহমান পিতাঃ মৃত মফিজ উদ্দিন	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাড়হাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৭	মোঃ লাল মিয়া পিতাঃ মৃত আব্দুল ছাত্তার মাতাঃ মৃত শরিফা খাতুন	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৮	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী (১) হাজরা বেওয়া (২) ছাবিয়া বেওয়া মৃত আফজাল হোসেন পিতাঃ মৃত হাজ্বি সবজান আলী মাতাঃ মৃত আমিরন বেওয়া	গ্রামঃ বলিরাম, ওয়ার্ড নং-০৬ ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
২৯	আবু তালেব মিয়া পিতাঃ মৃত খেজমতুল্লা	গ্রামঃ পূর্ব আমবাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩০	ভাতাভোগীঃ পুত্র মোঃ আরিফুল রহমান মৃত ইব্রাহিম খলিল পিতাঃ মৃত নখর উদ্দিন মাতাঃ মৃত ইতিমন	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩১	মোঃ উমর আলী পিতাঃ মরহুম আমির উদ্দিন মাতাঃ মরহুম মেহেরজন নেছা	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩২	মোঃ জহুর উদ্দিন পিতাঃ মরহুম ছফর উদ্দিন মাতাঃ মরহুম জাহেদা বেগম	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৩	মোঃ নাছির উদ্দিন পিতাঃ মরহুম নাহের উদ্দিন	গ্রামঃ ধনঞ্জয় (খেদাবাগ) ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৩৪	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী রোকেয়া বেওয়া মৃত আব্দুর রউফ মিয়া পিতাঃ মৃত পীর মামুদ	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৫	মোঃ আঃ মালেক পিতাঃ মৃত মোজাহার আলী	গ্রামঃ নওয়াবাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতাঃ মৃত মোজাম্মেল হক	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৭	মোঃ কফুর উদ্দিন পিতাঃ মৃত জব্বার আলী	স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ পশ্চিম ধনিরাম ডাকঘরঃ বড়ভিটা উপজেলাঃ ফুলবাড়ী জেলাঃ কুড়িগ্রাম বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৮	ভাতাভোগীঃ ছেলে মোঃ আনোয়ার মৃত নুরুল হক পিতাঃ মোহাম্মদ আলী	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৩৯	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী (১) সহিরন (২) মহিরন মৃত ফজলুল রহমান পিতাঃ মৃত আমির উদ্দিন	গ্রামঃ বড়বাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪০	মোঃ ইসহাক আলী পিতাঃ মৃত খেজমত আলী	গ্রামঃ পূর্ব আমবাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৪১	মোঃ মকবুল হোসেন পিতাঃ মরহুম মনির উদ্দিন	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪২	মোঃ সেকেন্দার আলী পিতাঃ মৃত আব্দুল মালেক মুন্সি মাতাঃ মৃত সামছের নেছা বেগম	গ্রামঃ ছাটহরনারায়ন ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৩	মোঃ আফতাব উদ্দিন পিতাঃ মৃত বসত উল্ল্য ব্যাপারী	গ্রামঃ চৈতন্য সিতারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৪	মোঃ আকবর আলী পিতাঃ মৃত ইসমাইল হোসেন মাতাঃ মৃত আজিরন নেছা	গ্রামঃ আশরতপুর (উত্তরপাড়া বস্তি) ডাকঘরঃ ক্যাডেট কলেজ, রংপুর উপজেলাঃ রংপুর সদর জেলাঃ রংপুর।
৪৫	মৃত জাবিদ আলী পিতাঃ মৃত বাচ্চা মিয়া	গ্রামঃ সুপরাজী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৬	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী (১) শাহাজাদী বেওয়া (২) গুল নাহার বেওয়া মৃত আবীর উদ্দিন পিতাঃ মৃত হাজী সবজান আলী মাতাঃ আমিরন বেওয়া	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৭	মোঃ আবদুল মান্নান পিতাঃ মৃত আহমেদ আলী মাতাঃ মৃত করজান বেওয়া	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৮	আঃ হক পিতাঃ মৃত আনছার আলী	গ্রামঃ সাদেককনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৪৯	মোহাম্মদ আলী পিতাঃ মৃত আব্বাস আলী মাতাঃ মৃত মিলিজান	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৫০	ভাতাভোগীঃ মালেক বেওয়া মৃত ছফর উদ্দিন পিতাঃ মৃত আলিমুদ্দিন	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫১	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী মোছাঃ রুপিয়া বেওয়া মৃত মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন পিতাঃ মৃত শরীফ উদ্দিন	গ্রামঃ জয়হরি ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫২	মোঃ সাইফুর রহমান পিতাঃ মৃত পয়েন উদ্দীন সরদার	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৩	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী নূর জাহান বেওয়া মৃত মজিবর রহমান পিতাঃ মৃত করিম উদ্দিন	গ্রামঃ চৈতনসীতারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৪	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী রাবেয়া বেওয়া মৃত ইদ্রিস আলী পিতাঃ মৃত মোহাম্মদ আলী মাতাঃ মৃত ইচিমন বেওয়া	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৫	শ্রী সিন্ধু ভূষন রায় পিতাঃ প্রয়াত কামিনী মোহন রায়	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৬	মোঃ মতিয়ার রহমান পিতাঃ মৃত মিন্নাত আলী	গ্রামঃ শিবরাম (জয়হরি) ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৭	মোঃ তমিজ উদ্দিন পিতাঃ মৃত মজাহার আলী মাতাঃ মৃত তহিরন বেওয়া	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৫৮	মোঃ জয়েন উদ্দিন পিতাঃ মৃত মাহার উদ্দিন	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৫৯	মোঃ আবু বকর মিঞা পিতাঃ মৃত রহমত উল্লা ব্যাপারী	গ্রামঃ বিদ্যাবাগিশ ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬০	মোঃ আব্দুল খালেক পিতাঃ মৃত মজাহার আলী মন্ডল (মোজাফ্ফর আলী মন্ডল) মাতাঃ মৃত অফিরন বেগম	গ্রামঃ চামারু ডাকঘরঃ বৈদ্যেও বাজার উপজেলাঃ রাজারহাট, জেলা কুড়িগ্রাম। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ নওয়াবাড়ী, ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬১	ভাতাভোগীঃ আমিনা বেওয়া মৃত আঃ জলিল পিতাঃ মৃত আব্বাস আলী	গ্রামঃ সুপরাজী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬২	মোঃ নুরুজ্জামান খন্দকার পিতাঃ মৃত আবুল কাশেম মাতাঃ মৃত উমিরুন নেছা	বর্তমানঃ গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট। সাবেক ঠিকানাঃ গ্রামঃ খেদাবাগ, ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট, উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৩	মোঃ আব্দুল হক পিতাঃ মৃত আবুল হোসন মাতাঃ মোছাঃ জহিরন নেছা	গ্রামঃ শিবরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৪	মোঃ জালাল উদ্দিন পিতাঃ মৃত জাফর উদ্দিন সরকার মাতাঃ মোছাঃ জহিরন নেছা	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৫	ভাতাভোগীঃ সাজেদা বেওয়া মৃত মনিরুজ্জামান খন্দাকার পিতাঃ মৃত ইব্রাহীম আলী খন্দকার	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৬৬	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক পিতাঃ মরহুম লতিফ খন্দকার	গ্রামঃ খেদাবাগ (পূর্ব আমবাড়ী) ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৭	মোঃ তৈফিকুল ইসলাম পিতাঃ মরহুম ছৈয়দুল হোসেন খন্দকার	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৮	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী খোতেজা বেওয়া মৃত রহমত আলী পিতাঃ মৃত ফৈমুদ্দিন মাতাঃ মৃত কবিরন বেওয়া	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৬৯	ভাতাভোগীঃ স্ত্রী ফাতেমা বেগম মৃত উমর আলী পিতাঃ মৃত বাটকারা	গ্রামঃ চৈতনসীতারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭০	আব্দুল হামিদ পিতাঃ মৃত তাহের মামুদ	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭১	আবু ছৈয়দ পিতাঃ মৃত একাব্বর আলী	গ্রামঃ সুপরাজী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭২	মোঃ আঃ রহমান পিতাঃ মৃত বাদশা মিয়া	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৩	শ্রী নিরঞ্জন চন্দ্র রায় পিতাঃ মৃত সর্বানন্দ রায়	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৪	মোঃ ওসমান আলী পিতাঃ মৃত ওসি মামুদ	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৭৫	মোঃ আজগর আলী পিতাঃ মৃত মিয়াজ উদ্দিন ব্যাপারী মাতাঃ মোছাঃ আলেকজন বেওয়া	গ্রামঃ নওয়াবাড়ী ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৬	জগদীশ চন্দ্র সরকার পিতাঃ মৃত গোপাল চন্দ্র সরকার মাতাঃ মৃত কামিনী রায়	গ্রামঃ ছাপহরনারায়ন ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৭	মোঃ আকবর আলী পিতাঃ মৃত আছিমুদ্দিন মাতাঃ মৃত কেছুয়ানী	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৮	ভাতাভোগীঃ মৃত আকবর আলী পিতাঃ মৃত বাহার উদ্দিন মাতাঃ মৃত কেছুয়ানী	গ্রামঃ আইরখামার ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৭৯	ভাতাভোগীঃ মনোয়ারা বেগম মৃত আজাহার আলী মন্ডল পিতাঃ মৃত মিরপাতু মন্ডল মাতাঃ মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	গ্রামঃ রুদ্রারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৮০	মোঃ হায়দার আলী পিতাঃ মৃত কান্দুরা মামুদ (মহিমুদ্দিন)	ঠিকানাঃ গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ রুদ্রারাম ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৮১	মোঃ মোজাম্মেল হক পিতাঃ মৃত মবারক আলী মাতাঃ মৃত মাইয়ো বেওয়া	গ্রামঃ বলিরাম ডাকঘরঃ খেদারাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৮২	মোঃ সহিদার রহমান পিতাঃ মৃত সাহার উদ্দিন মাতাঃ মৃত মাইয়ো বেওয়া	গ্রামঃ সাদেকনগর ডাকঘরঃ বড়বাড়ী উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

৮৩	মজিবর রহমান পিতাঃ মৃত করিম উদ্দিন সরদার মাতাঃ মৃত মাইয়ো বেওয়া	গ্রামঃ খেদাবাগ ডাকঘরঃ খেদাবাগ (সেলিম নগর) উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।
৮৪	মোঃ কফিল উদ্দিন পিতাঃ মৃত কেফায়েত উল্লা মাতাঃ মৃত জরিনা	বর্তমানঃ গ্রামঃ উত্তর গাওয়াইর ডাকঘরঃ হজ্জ ক্যাম্প-১২৩০. দক্ষিণ খান, ঢাকা। অস্থায়ীঃ গ্রামঃ বড়বাসুরিয়া, ডাকঘরঃ খেদাবাগহাট উপজেলাঃ লালমনিরহাট সদর জেলাঃ লালমনিরহাট।

সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০.০০২.২২০০২.২০১৩-৩১৮
তারিখ ঃ ২৩ আগষ্ট ২০১৫